পাঠমালিকা

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

পাঠমালিকা

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

প্রথম সংস্করণ : ১৯৬৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৭৫
তৃতীয় মুদ্রণ : ১৯৭৬

মূল্য : দুই টাকা পঁচিশ পয়সা

প্রকাশক :
শ্রীঅনিল চন্দ্র বিশ্বাস
সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৭৭।২ পার্ক স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৬

মুদ্রাকর :
শ্রীচঞ্চল ভাওয়াল
প্রেস্টিজ প্রিন্টার্স
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

এই গ্রন্থে যে-গদ্যাংশ ও কবিতাগুলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেগুলি প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে—

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আবহাওয়া' ও তাঁর নিজের লেখা 'চরণিক' থেকে নেওয়া 'চরণিক' গল্পাংশের জন্য;

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মাস্টার মহাশয়' গল্পাংশের জন্য;

শ্রীপ্রতীপকুমার বসু—রাজশেখর বসুর লেখা 'কৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত মহাভারত' থেকে নেওয়া 'জতুগৃহদাহ' গদ্যাংশের জন্য;

শ্রীঅমলচন্দ্র ভট্টাচার্য—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা 'পদার্থবিদ্যা' থেকে নেওয়া 'রং' গদ্যাংশের জন্য;

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেন—সুরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা 'সেকালের বাজার দর' প্রবন্ধের জন্য;

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁর লেখা 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাস থেকে নেওয়া 'হিজল বিল' গদ্যাংশের জন্য;

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র—তাঁর লেখা গল্প 'চড়ুই পাখীরা কোথায় যায়' এবং 'ভাড়াটে কুঠি' কবিতার জন্য;

শ্রীলীলা মজুমদার—তাঁর লেখা 'পেয়ারা গাছের নীচে' গদ্যাংশের জন্য;

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—তাঁর লেখা 'বংশগৌরব' ও 'চণ্ডালী' কবিতার জন্য;

কালিদাস রায়—তাঁর লেখা কবিতা 'প্রাচীন ভারত' কবিতার জন্য;

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য—সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'মহাত্মাজীর প্রতি' কবিতার জন্য,

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'বর্ষা' কবিতার জন্য;

বিশ্বভারতী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দীন দান', 'প্রভাত-উৎসব', 'সভ্যতার প্রতি', 'খরবায়ু বয় বেগে', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতা, 'কাবুলিওয়ালা' গল্প, 'ছোটনাগপুর' ও 'বর্তমান যুগ' প্রবন্ধের জন্য;

ডি. এম. লাইব্রেরি—কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'পথচারী' কবিতার জন্য ;
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বিন্দুর ছেলে' গল্পাংশের জন্য।

নিম্নলিখিত রচনাগুলির জন্যে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে না জানায় আমাদের অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা তাঁদের অনুমতি নিতে স্বীকৃত রইলাম—

পাছে লোকে কিছু বলে	ঃ	কামিনী রায়
ভারত-সঙ্গীত	ঃ	অতুলপ্রসাদ সেন
বর্ষায়	ঃ	করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
পুষ্প জীবন	ঃ	মোহিতলাল মজুমদার

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

॥ রামজয় তর্কভূষণ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোন কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা ও আনুগত্য করিতে পারেন নাই; তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য তাঁহার পক্ষে কস্মিন্ কালেও আবশ্যক হয় নাই।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তর্কভূষণ মহাশয় নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক বীরসিংহবাসে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্যালক শ্যামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা বুঝিতে পারিলে তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয় কোনও কারণে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইতেন না।

তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি গ্রামের প্রধানেরা নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন; আপন ইষ্টসাধন বা অভিপ্রেত সম্পাদনের জন্য না করিতে পারিতেন এমন কর্মই নাই। এতদ্ভিন্ন, সময়ে সময়ে এমন নির্বোধের কার্য করিতেন যে, তাঁহাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে এরূপ বোধ হইত না। এজন্য তর্কভূষণ মহাশয় সর্বদা সর্বসমক্ষে মুক্তকন্ঠে বলিতেন, এ গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপট মনে করিতেন তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাচী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে অথবা অন্য কোন কারণে তিনি কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন বটে, কিন্তু তদীয় আকারে আলাপে বা কার্যপরম্পরায় তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে অথবা তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায় তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোনও বিষয়ে সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন, এজন্য সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দেশ করিতেন। বনমালিপুর হইতে প্রস্থান করিয়া যে আট বৎসর অনুদ্দেশ-প্রায় হইয়াছিলেন, ঐ আট বৎসরকাল কেবল তীর্থপর্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্যন্ত পর্যটন করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী এবং সর্বতোভাবে

অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যূষে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল, এজন্য অনেকে সমবেত না হইয়া ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস, ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায় সকল সময়ে ঐ সকল স্থল দিয়া একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই চারিবার আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু উপযুক্তরূপে আক্কেলসেলামী পাইয়া আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

একুশ বৎসর বয়সে তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। এক স্থলে খাল পার হইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র ভালুকে আক্রমণ করিল। ভালুক নখর প্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনি অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন। এইরূপে, এই ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন বটে; কিন্তু তৎকৃত ক্ষতদ্বারা তাঁহার শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ঐ অবস্থাতে তিনি অনায়াসে পদব্রজে মেদিনীপুর পঁহুছিলেন, এক আত্মীয়ের বাসায় দুই মাস কাল শয্যাগত থাকিলেন; এবং ক্ষত সকল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত।

॥ বন্দে মাতরম্ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিলেন। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্তি, ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই; সেই রণনিপুণ বীরমূর্তি—সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্তি আর নাই। এখনই যে গর্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সে মূর্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শক্তিশালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর-কানন-নগ-নদনদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্তি হইল। সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথা-বার্তার জন্য বড় ব্যাগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিলেন না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না—সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্যশ্যামলা, মাতা কে? জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতা কে?" উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাহিতে লাগিলেন—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥"

মহেন্দ্র বলিলেন, "এ ত দেশ, এত মা নয়!"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।" ভবানন্দ আবার গাহিলেন—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং, সুফলাং, মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং, সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং, বরদাং, মাতরম্॥
সপ্তকোটিকন্ঠ—কল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমল-দলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িণী নমামি ত্বাং,

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥"

মহেন্দ্র দেখিলেন, দস্যু গাহিতে গাহিতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কারা?"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা সন্তান।"

মহে। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবা। মায়ের সন্তান।

মহে। ভাল—সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহে। এই ত গাড়ী লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি-ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার?

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভাগ।

ভবা। যে-রাজা রাজ্যপালন করে না, সে আবার রাজা কি?

॥ আমোদের সংযম শিক্ষা ॥

চন্দ্রনাথ বসু

পৃথিবী মনুষ্যের কর্মক্ষেত্র। কর্ম না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। জীবন রক্ষার্থ মানুষের যাহা আবশ্যক, কর্ম ব্যতীত তাহা পাওয়া যায় না। ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, ব্যসার্থ গৃহ, পরিধানার্থ বস্ত্র, রোগে ঔষধ—এসমস্ত কর্মদ্বারা লাভ করিতে হয়, মানুষের অন্যরূপ প্রয়োজনও অনেক। জ্ঞানোপার্জন, বিদ্যোপার্জন, স্বার্থসাধন, পরার্থসাধন, ধর্মসাধন—এইরূপ অনেক প্রয়োজন আছে। এসমস্তই কর্ম—কর্মভিন্ন ইহার কোনটাই সিদ্ধ হয় না। চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিলে ইহার কোনটাই সম্পন্ন হয় না। শুদ্ধ তাহাই নহে। কর্ম প্রাণপণে করিতে হয়—প্রাণপণে না করিলে কর্ম নিষ্ফল হয়। কর্মে একাগ্রতা, অধ্যবসায়, শারীরিক; মানসিক উভয়বিধ শ্রম আবশ্যক। এত শ্রম আবশ্যক যে, মানুষকে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। তখন শরীরে এবং মনে নূতন বল সঞ্চারিত করিতে না পারিলে, দুইই ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে হয়—হয় ত মৃত্যুও ঘটে। আহারে শরীরের ক্ষয়ের পূরণ হয়—শরীরের শ্রান্তি দূর হয়। শরীরের শ্রান্তি দূর হইলে মনের শ্রান্তিরও উপশম হয়। কিন্তু মনের অবসাদ দূর করিবার শ্রেষ্ঠতর উপায় আছে। সে উপায় আমোদ। সমস্ত দিন কর্মস্থানে কঠিন পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া গৃহে আসিয়া স্নেহ-ভক্তি-ভালবাসার পাত্রগুলিকে লইয়া দুই দণ্ড বসিলেই মনের অবসাদ দূর হইয়া যায়, মন আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠে—সঙ্গে-সঙ্গে শরীরও সুস্থ ও সবল হয়। কার্ডিনাল রিচিলিউ ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুইসের প্রধান-মন্ত্রী ছিলেন—কর্মের অবতার বলিলেই হয়—কত কাজ করিতেন, কত ভাবিতেন, কত চিন্তা করিতেন তাহার সীমা ছিল না। অত বড় রাজমন্ত্রী কমই দেখা গিয়াছে। কিন্তু তিনি সময়ে-সময়ে একটা ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে ঘোড়া হইতেন, তাঁহার ছেলেরা তাঁহার পিঠে বসিত, তিনি তাহাদিগকে

লইয়া সমস্ত ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। দিক্‌পালতুল্য পুরুষ ছেলের মতন হইয়া ছেলের সঙ্গে ছেলেখেলা করিতেন—ছেলেখেলা না করিলে চলিত না বলিয়া ছেলেখেলা করিতেন। মানুষ অক্ষয়, অমর, অব্যয় নয়। শক্তির প্রয়োগে মানুষের শক্তিনাশ হয়, বল বিনিয়োগে মানুষের বলক্ষয় হয়, সুতরাং শ্রমে মানুষের শ্রান্তি হয়। অতএব শ্রমের পর বিশ্রাম আবশ্যক, অপরিহার্য। বিশ্রাম বলিতে কেবল চুপ করিয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকা বুঝায় না। যে-কার্য করিয়া শ্রান্তি হয়, তাহা ছাড়িয়া লঘুতর বা ভিন্ন প্রকৃতির কার্য করিলেও বিশ্রাম করা হয়। কার্ডিনাল রিচিলিউ কঠিন রাজকার্যে ক্লান্ত হইয়া ছেলেদের সঙ্গে ঘোড়া-ঘোড়া খেলিয়া বিশ্রামলাভ করিতেন।

যেখানে শ্রম; সেইখানেই বিশ্রামের প্রয়োজন—যেখানে কর্ম, সেইখানেই আমোদের আবশ্যকতা। আমোদ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী নাই। আমোদ কর্মেরই অংশ—কর্মের অন্তর্ভূত, কর্মের অন্তর্গত। যাহাদের কর্ম নাই, তাহাদের আমোদের প্রয়োজন নাই, সুতরাং আমোদে অধিকারও নাই। আমোদে তাহাদের মহৎ অনিষ্ট ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্যোচিত কর্ম না করিয়া, মনুষ্যোচিত কর্ম করিতে অসমর্থ হইয়া, বসিয়া-বসিয়া কেবল আমোদ-আহলাদ করা সর্বপ্রকার অধোগতি, সর্বপ্রকার সর্বনাশ সাধন করিবার অমোঘ, অব্যর্থ উপায়। আমাদের এখন যে কর্ম নাই, আমরা যে কর্মী নই, আমরা এখন যে কর্ম করিতে অসমর্থ, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারি না, কলকারখানা চালাইতে পারি না, পূর্বপুরুষের জমিদারী পাইয়া তাহা উড়াইয়া দিই, একটা তিন হাত রেলের রাস্তা করিয়া চালাইবার দোষে সর্বত্র নিন্দিত হই, পারি কেবল পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ইস্কুল কলেজ করিতে! কিন্তু দেখিতেছি, আমাদের আমোদ বাড়িতেছে, আমোদ আহলাদের বিপুল অনুষ্ঠান হইতেছে।

আমাদের আমোদপ্রিয়তা এতই প্রবল হইয়াছে যে, আমরা ধর্মচর্যাও আমোদে পরিণত করিতেছি। আমাদের অনেকের দুর্গোৎসবে সাত্ত্বিক ভাব আর নাই, ভক্তিভাব আর দৃষ্ট হয় না, ভক্তের একাগ্রতা, উন্মত্ততা বিলুপ্ত; অন্নদান বস্ত্রদান নাই, আছে কেবল আমোদ-আহলাদ-নেশা-নাচ থিয়েটার! ইহার অপেক্ষা

অধোগতি আর হইতে পারে না। ধর্মচর্যাকে ইন্দ্রিয়চর্যা করিয়া তোলা বড় ভয়ানক কাজ। এমন কাজ যে করিতে পারে, তাহার বাহ্যজগৎই সর্বস্ব, অন্তর্জগৎ বিলুপ্ত। সে আপন কাজ এবং পরের কাজ, সকল কাজ করিবারই অনুপযুক্ত। তাই আমরা কোন কাজই করিতে পারিতেছি না, আমাদের কাজের সকল উদ্যমই নিষ্ফল হইতেছে। বাহ্যবস্তুর মোহ কাটান বা কমান ভিন্ন ইহার প্রতিকার নাই। আমাদের কিরূপ অন্তঃসারশূন্যতা ও অধঃপতন হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নহে—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যে-জ্ঞান এবং চৈতন্যের প্রয়োজন তাহা বিলুপ্ত হয় নাই; বিলুপ্ত হইবেও না, কেবল আমাদের ধর্মভাবের প্রাণহীনতার উপর একটা প্রকাণ্ড মোহকর চাক্‌চিক্যময় বাহ্য-জগৎ আসিয়া পড়ায় চাপা পড়িয়াছে। এই জন্যই এই সকল কথা কহিতেছি, নহিলে কহিতাম না। অতএব, আমাদের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধীরে-ধীরে কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বাহ্যবস্তু বা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সংযমী হইতে হইবে—অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর দিকে ইন্দ্রিয়াদির যে স্বাভাবিক আবেগ আছে—একটা প্রকাণ্ড বাহ্যময়ত্ব আমাদের প্রাণশূন্য ধর্মভাবের উপর নিপতিত হইয়া আবেগকে এত বাড়াইয়া দিয়াছে—তাহা কমাইয়া ফেলিয়া, বাহ্যবস্তুকে আর কুকথা কহিতে দেওয়া হইবে না, আর আধিপত্য করিতে দেওয়া হইবে না। বাহ্যবস্তুর মোহ একবার নষ্ট করিতে পারিলে, বাহ্যবস্তুকে একটু সরাইয়া ফেলিতে পারিলে, আর বড় ভাবিতে হইবে না। দৃষ্টি আপনাআপনিই বাহ্যজগৎ হইতে ফিরিয়া অন্তর্জগতের উপর পড়িবে। বাহ্যজগতের বাহ্যশক্তি যতই হউক, অন্তর্জগতের ন্যায় অন্তর্নিবিষ্ট শক্তি উহার নাই। অন্তর্জগতে একবার দৃষ্টি পড়িলে ধর্ম প্রাণ প্রবেশ করিবে, আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকার শক্তি বর্ধিত হইবে, একক বা সম্মিলিতভাবে সকল সৎকর্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য জন্মিবে।

।। অনাথ বালক ।।

চন্দ্রশেখর কর

শ্রাবণ মাস। সূর্য অস্ত যাইবার এখনও বেশ বিলম্ব আছে। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায়, দিনেই যেন সন্ধ্যা হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দুর স্কুলের ছুটী হইবার পর, মেঘ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। আকাশের যে-যে কোণ একটু একটু পরিষ্কৃত ছিল, একে-একে মেঘে পুরিয়া কাল হইয়া আসিল। মেঘ ক্রমেই গাঢ় হইতেছে, সঙ্গে-সঙ্গে বাতাস উঠিয়াছে। বৃষ্টির পূর্বচিহ্ন, দু' একটি পক্ষী লক্ষ্যহীনভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ইন্দু এই নির্দয় গগনের নীচে দিয়া বাড়ী মুখে ছুটিয়াছে। তাহার পরিধানে একখানি কস্তাপেড়ে বিলাতী ধুতি, গায়ে একখানি আধময়লা বিলাতী চাদর, বাম বগলে কয়েকখানি পুস্তক ও কাগজ। জামা, জুতা, ছাতা কিছুই নাই। ইন্দু গোবিন্দবেড় গ্রাম ছাড়াইয়া সেই বড় মাঠটিতে আসিয়া পড়িয়াছে। পথে একটিও লোক দৃষ্ট হইতেছে না। কেবল দু' একজন রাখাল গরু তাড়াইতে-তাড়াইতে গ্রামাভিমুখে ছুটিতেছে। অন্যান্য গরুগুলি সম্মুখে রাখিয়া যার পালে যেটি দুষ্ট, সেইটির লেজ মলিতে-মলিতে, কখনও কখনও দৌড়াইতে-দৌড়াইতে, কখনও বা লাফাইতে-লাফাইতে রাখালগণ যাইতেছে। কেহ-কেহ অপূর্ব সুরে গান ধরিয়াছে। মধ্যে-মধ্যে দু' একটি গরু রাস্তা ছাড়িয়া এদিকে ওদিকে গেলেই রাখাল দুষ্ট গরুটির লেজ ছাড়িয়া দিয়া পথভ্রষ্ট গরুর দিকে দৌড়াইতেছে, এবং ধরিতে পারিলেই দু' এক ঘা লাঠি মারিয়া, মধুর সম্ভাষণে তাহাকে আনিয়া পালে মিশাইতেছে।

ইন্দু রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়াছে। এক-একবার আকাশের দিকে চাহিতেছে, আবার ছুটিতেছে। মাঠ ফুরাইল, ইন্দু আসিয়া নদীর নিকটে পঁহছিল। সম্মুখেই খেয়াঘাট। চৈত্র-বৈশাখে এ নদী লোকে হাঁটিয়া পার হয়; কিন্তু বর্ষা-কালে ইহার মূর্তি ভয়ানক হইয়া উঠে। ইন্দু দেখিল, খেয়ার নৌকা এ পারেই আছে, কিন্তু তাহাতে তিনটি লোক উঠিয়াছে। দু' তিন রসি দূর থাকিতেই ইন্দু

চেঁচাইতে লাগিল---"ওগো, আমাকে নিয়ে যেও।" নৌকার লোক বোধ হয় শুনিতে পাইল না। শুনিয়া থাকিলেও তাহারা নৌকা রাখিল না, ছাড়িয়া দিল। বালক---প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল, যখন ঘাটে আসিয়া পঁহুছিল, তখন নৌকা প্রায় সিকি নদী আসিয়া পড়িয়াছে। ইন্দু পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিল। নৌকায় দুটি যুবক ও একটি বৃদ্ধ ছিল। যুবকেরা নৌকা বাহিতেছিল। বৃদ্ধটি বালকের করুণাব্যঞ্জক স্বর শুনিয়া কহিতে লাগিল—"ওগো নৌকাটা ফিরাও না, ছেলেটিকে নিয়ে এস। ও সেই ফতেপুরের মিত্রদের ছেলেটি। রোজ বাড়ী থেকে গোবিন্দবেড়ে পড়তে যায়। আজি যে দিন---হয় ত আর নৌকা এ পাড়ে আসবে না---ছেলেটি প'ড়ে থাক্‌বে। ওর বাড়ীর লোকে কত ভাববে এখন।" পশ্চাতে যে লোকটি হা'ল ধরিয়াছিল সে বলিল,—"রেখে দাও তোমার ছেলেটি। পারের প্রায় অর্ধেক এসে প'ড়লাম, এখন আবার ফিরে যাব?" সম্মুখে যে লোকটি দাঁড় টানিতেছিল, তাহারও এই মত হইল। সুতরাং বৃদ্ধের কথা টিঁকিল না। ইন্দু এ-পারেই পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধ তবু একবার বলিল---"আহা! ছেলেটি কোথায় যাবে এখন!"

হায়রে স্বার্থপর মানুষ! ছেলেটিকে লইয়া যাইতে কতই আর বিলম্ব হইত! নিজের হয় ত' সে সময়টুকুতে কিছুই কাজ হইবে না। অথচ বালকটিকে ফেলিয়া গেলে! সংসারে অনেক লোকই এই শ্রেণীর। রেলওয়ে গাড়ীতে, পারঘাটা প্রভৃতি স্থানে স্বার্থপরতা বড়ই পরিস্ফুটভাবে পরিলক্ষিত হয়। গাড়ীতে স্থান রহিয়াছে, অথবা যাহা আছে, তাহাতে আগন্তুক অনায়াসে যাইতে পারে; কিন্তু তাহাকে উঠিতে দেওয়া হইবে না---নিজে পা ছড়াইয়া বসিব---হয়ত আমার অপেক্ষা তাহার যাইবার প্রয়োজন অনেক অধিক। কিন্তু তাহা কয়জনে ভাবিয়া থাকেন?

ইন্দু খানিকক্ষণ ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিল, সেদিন আর নৌকা এ পারে আসিবার সম্ভাবনা নাই। এক-একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, সাঁতরাইয়া যাই। কিন্তু জলের বেগ দেখিয়া তাহার সাহসে কুলাইল না। ইন্দু সন্তরণে তেমন পটু নহে। সুতরাং পশ্চাতে ফেরা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অগত্যা ইন্দু তাহাই চলিল। দু' এক পা যায়, আবার খেয়াঘাটের দিকে ফিরিয়া

আসে ; যদি একটি লোকও এসে পড়ে। কিন্তু মানুষ কেন, অন্য প্রাণী পর্যন্তও দৃষ্ট হইতেছে না। এদিকে মেঘ সমস্ত গগন ছাইয়া পড়িল—শীতল বাতাস উঠিল—ইন্দু বুঝিল, এখনই জল আসিবে। আন্দাজ এক পোয়া রাস্তা না গেলে, আর মানুষের বাড়ী মিলিবে না। ইন্দু দৌড়াইল। খানিকটা যাইতেই বৃষ্টি নামিল। মাঠের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড গাছ দেখিয়া বালক তাহার নীচে যাইয়া উঠিল। চাদরখানি ভাঁজ করিয়া তদ্দারা বই ক'খানি জড়াইয়া লইল, এবং খালি-গায়ে, খালি-মাথায় বৃক্ষের গুঁড়িটীর নিকটে দাঁড়াইল। প্রথম দু'চারি ফোঁটা বৃষ্টি তাহার গায়ে লাগিল না বটে, কিন্তু যখন বৃষ্টি অধিক হইল, গাছের পাতা সমস্ত ভিজিয়া গেল, তখন বরং মোটা-মোটা ফোঁটা বালকের মস্তকে এবং গাত্রে পড়িতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি কেবল সেই চাদরমোড়া বই ক'খানির প্রতি—পাছে সেগুলি ভিজে। নিজের শরীরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই। কিন্তু মানুষ কতক্ষণ মস্তক পাতিয়া অবিরাম মূষলধারার শ্রাবণের ধারা সহ্য করিতে পারে? ক্রমে বালকের শীত ধরিল। এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার ক্রমশঃই বাড়িতেছে। সাঁ-সাঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে। মধ্যে মধ্যে বিজলি খেলিয়া কড়-কড় শব্দে মেঘগর্জন হইতেছে। ইন্দুর শিরায়-শিরায় যেন আতঙ্কের বিদ্যুৎ খেলিতেছে। খানিকটা গেলেই একটা মুসলমানের বাড়ী পাওয়া যায়। বইশুদ্ধ চাদরখানি কোঁচার কাপড়ের ভিতর রাখিয়া, একহাতে সেই কাপড় ধরিয়া ইন্দু মুসলমানের বাড়ীর দিকে দৌড়াইল এবং ভিজিতে ভিজিতে যাইয়া বাহিরে গোয়ালঘরের দরজায় আশ্রয় লইল। সেখানে বই ক'খানি রাখিয়া, কোঁচার কাপড়টী খুলিল, এবং তদ্দারা মস্তক এবং গাত্র মার্জনা করিয়া ফেলিল। চাদরখানি খুলিয়া গায়ে দিল এবং কতক্ষণে বৃষ্টি ধরিবে, অন্য এক বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ইন্দু দেখিতে পাইল, নিকটে একটি কুক্কুটী অনেকগুলি শাবক লইয়া পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছে। যেটী বাহিরে পড়িতেছে, সেইটীকে ভিতরে টানিতেছে। বালক দেখিয়াই মনে-মনে কহিল,—"হায়! সন্তানের উপর মার মায়া! মুরগীটা পারিতেছে না, অথচ সকল ছানাগুলিকেই ঢেকে রেখে বৃষ্টি থেকে বাঁচাইবার চেষ্টা! আমার কাকীমা কিন্তু মা'র চেয়েও বেশী। বোধ হয়,

মা থাকলেও আমার এমন যত্ন হইত না। কিছু নাই, তবু সেই ভাঙ্গা ঘরেই কাকীমা আমাকে অতিকষ্টে এই রকম ক'রে ঢেকে রাখেন। কাকীমা, তোমার ঋণ আমি জন্মজন্মান্তরে শুধ্‌তে পার্‌ব না। তুমি না থাকিলে, এতদিন আমি কোথায় যেতাম। আজ এতক্ষণ তুমি আমার জন্য কতই ভাব্‌ছ—কতই কাঁদছ।" এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে ইন্দু দেখিল, মাঠের দিক হইতে তাল পাতার টোকা মাথায় দিয়া একটি লোক একটা গরু তাড়াইতে-তাড়াইতে গ্রামাভিমুখে আসিতেছে। বলিতেছে—"শালার গরু, তখন রাখালের সঙ্গে গেলে আমার এ ভোগটা হয় না, এতটা বৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়া যায় না।" ইন্দুর অমনিই মনে হইল,—"হায় রে! সংসারে একটা গরুর খোঁজ নিতেও মানুষ আছে; কিন্তু আমার খোঁজ নির্তে কেহই নাই। হারে রঘু দাদা, আজ যদি তুমি থাক্‌তে, তবে নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজতে বেরুতে। কত ভালোই বাস্‌তে আমায়? তুমি বেঁচে থাকলে, আমার আর কাকীমার উপকার হবে ব'লেই কি লোকে তোমায় মেরে ফেল্ল?"

বালক কাঁদিয়া ফেলিল।

জ্ঞানদা, এই তোমার পুরস্কার। ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের এমন অকপট কৃতজ্ঞতা জগতে কয়জনে অর্জন করিতে পারেন।

রঘু! এই তোমার মৃত্যুর পর মর্মরনির্মিত স্মৃতি-চিহ্ন! অথবা প্রস্তর ক্ষোদিত প্রতিমূর্তি ইহা অপেক্ষা শতগুণে নিকৃষ্টতর। কোন পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর সভাস্থলে শত-শত লোক সমবেত হইয়া কন্ঠস্থ বক্তৃতার উদ্‌গিরণে, মৃত ব্যক্তির যে-স্তুতিগান করেন, এই সরল বালকের স্বতঃপ্রণোদিত একটী কথাও তদপেক্ষা অধিক মূল্যবান্‌। ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণও যাহার জীবনে একটীও অন্যায় কার্য দেখাইতে না পারেন, যদি একজন লোকও তৎকৃত উপকার স্মরণে চক্ষের জল ফেলে, তবে তদপেক্ষা শ্লাঘ্যজীবন আর কি হইতে পারে?

।। ছোটনাগপুর ।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাত্রে হাবড়ায় রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া পাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায় ঘুমে, স্বপ্নে, জাগরণে, খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে-মাঝে আলোর শ্রেণী, ঘন্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে স্টেশনের নাম হাঁকা, আবার ঠং-ঠং-ঠং তিনটে ঘন্টার শব্দে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্হিত, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ীর চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে-তালে মাথার ভিতরে সৃষ্টি-ছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটের সময় মধুপুর স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হয়। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানালায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম।

গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকারেখা দেখা যায়; সেই নদীর পথে বড়ো-বড়ো, কালো-কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে-মাঝে এক-একটা মুণ্ডের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল, যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে; আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে, কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে। ওই দেখো, পাথরের মতো কালো ঝাঁকড়া-চুলের-ঝুটি-বাঁধা মানুষ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া। দুটো মহিষের ঘাড়ে একটি লাঙল জোড়া, এখনো চাষ আরম্ভ হয় নাই, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে-মাঝে এক-একটা জায়গা ঘৃতকুমারীর বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার তক্‌তক্ করিতেছে, মাঝখানে একটি বাঁধানো ইঁদারা। চারি-দিক বড়ো শুষ্ক দেখাইতেছে। পাতলা লম্বা শুকনো সাদা ঘাসগুলো কেমন

যেন পাকাচুলের মতো দেখাইতেছে। বেঁটে-বেঁটে পত্রহীন গুল্মগুলি শুকাইয়া বাঁকিয়া কালো হইয়া গেছে। দূরে-দূরে এক-একটা অশত্থগাছ, আমগাছও দেখা যায়। শুষ্কক্ষেত্রের মধ্যে একটি মাত্র পুরাতন কুটিরের চাল---শূন্য ভাঙা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে একটা মস্ত গাছের দগ্ধ গুঁড়ির খানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিধি স্টেশনে গিয়া পেঁাছিলাম। আর রেলগাড়ি নাই। এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়ি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। একে কি আর গাড়ি বলে? চারটে চাকার উপর একটা ছোটো খাঁচা মাত্র।

সর্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাক-বাংলার যতদূরে চাই, ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে-মাঝে গোটাকতক গাছ আছে। চারিদিকে যেন রাঙামাটির ঢেউ উঠিয়াছে। একটা রোগা টাট্টু ঘোড়া গাছের তলায় বাঁধা। চারিদিকে চাহিয়া কি যে খাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না, কোনো কাজ না থাকাতে গাছের গুঁড়িতে গা ঘষিয়া গা চুলকাইতেছে। আর একটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মতো একটু-একটু সবুজ উদ্ভিদ পদার্থ পট্‌পট্‌ করিয়া ছিঁড়িতেছে। এখান হইতে যাত্রা করা গেল। পাহাড়ে রাস্তা। সম্মুখে, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শুষ্ক, শূন্য, সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুইয়া আছে। একবার কষ্টেসৃষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও রাস্তার উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড়্‌গড়্‌ করিয়া দ্রুতবেগে ঢালু রাস্তায় নামিয়া যাইতেছে। ক্রমে চলিতে-চলিতে আশেপাশে পাহাড় দেখা দিতে লাগিল। লম্বা-লম্বা, সরু-সরু শালগাছ। উইয়ের ঢিবি। কাটা গাছের গুঁড়ি। স্থানে স্থানে এক-একটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্য গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক, শীর্ণ, অস্থিময় দীর্ঘ আঙুল আকাশের দিকে তুলিয়া আছে; এই পাহাড়গুলোকে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ হইয়াছে, যেন ভীষ্মের শরশয্যা হইয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়া অল্প-অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে-টানিতে মাঝে-মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক

জায়গায় পথ অবসান হইয়া বিস্তৃত বালুকাশয্যায় একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল 'বড়াকর নদী'। টানা টানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল। রাস্তার দুই পাশে ডোবাতে জল দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে চার পাঁচটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া অর্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলস্যভরে আমাদের দিকে এক-একবার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

যখন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। অদূরে দুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া উঠিয়া নামিয়া পথ গিয়াছে। যেখানেই চাহি চারিদিকে লোক নাই, লোকালয় নাই, শষ্য নাই, চষা মাঠ; চারি-দিকে উঁচুনিচু পৃথিবী নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ, কঠিন সমুদ্রের মতো ধূ-ধূ করিতেছে। দিগ্‌-দিগন্তের উপরে গোধূলির চিক্‌চিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও জনমানব, জীবজন্তু নাই বটে; তবু মনে হয়, এই সুবিস্তীর্ণ ভূমিশয্যায় যেন কোন্ এক বিরাট পুরুষের জন্য নিদ্রার আয়োজন হইতেছে। কে যেন প্রহরীর ন্যায় মুখে আঙ্গুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে ভয়ে নিশ্বাস রোধ করিয়া আছে। দূর হইতে উপছায়ার মতো একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোনোমতে জাগিয়া, ঘুমাইয়া, পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি বামে ঘনপত্রময় বন। গাছে-গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুল্মে আচ্ছন্ন। বনের মাথার উপর দিয়া দূর পাহাড়ের নীল শিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত-মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক-একটা গাছ; তাহাদের ক্ষুধিত শিকড়গুলি দীর্ঘ হইয়া চারিদিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথর-খানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খাদ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল। সুদূরবিস্তৃত মাঠ। দূরে গোরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মতো ছোটো-ছোটো দেখাইতেছে। মহিষ কিম্বা গোরুর কাঁধে লাঙল দিয়া, পশুর লাঙ্গুল মলিয়া চাষারা চাষ করিতেছে। চষামাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাগের ডাকবাংলায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে হাজারিবাগ শহরটি অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। শাহরিক ভাব বড়ো নাই। গলি-গুঁজি, আবর্জনা, নর্দমা, ঘেঁষাঘেঁষি, গোলমাল, গাড়িঘোড়া, ধুলোকাদা, মাছিমশা, এ সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই; মাঠ-পাহাড়-গাছপালার মধ্যে শহরটি তক্‌তক্‌ করিতেছে।

এক দিন কাটিয়া গেল। এখন দুপুর বেলা। ডাকবাংলার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ সুনীল। দুইখণ্ড শীর্ণ মেঘ শাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অল্প-অল্প বাতাস আসিতেছে। এক-রকম মেঠো-মেঠো, ঘেসো-ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। দুই শালিক বারান্দায় আসিয়া চকিতভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের রাস্তা দিয়া গোরু লইয়া যাইতেছে, তাহাদের গলার ঘন্টার ঠুং-ঠাং শব্দ শুনিতেছি। লোকজনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া, কেউ কাঁধে মোট লইয়া, কেউ দু-একটা গোরু তাড়াইয়া, কেউ একটা ছোটো টাট্টুর উপর চড়িয়া, রাস্তা দিয়া অতি ধীরেসুস্থে চলিতেছে; কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয়, এখানকার মানব-জীবন দ্রুত এঞ্জিনের মতো হাঁসফাঁস করিয়া অথবা গুরুভারাক্রান্ত গোরুর গাড়ির চাকার মতো আর্তনাদ করিতে-করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায়-ছায়ায় কুলকুল করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে। সম্মুখে ওই আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোর মূর্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে-উকিলে শামলায় শামলায় লড়াই বাধিয়াছে তখন বাহিরের অশথগাছ হইতে দুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হাহা করিয়া হাসিতেছে, এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে-মাঝে আদালত হইতে মধ্যাহ্নের ঘন্টা বাজিতেছে। চারিদিকে যখন জীবনের মৃদুমন্দ গতি, তখন এই ঘন্টার শব্দ শুনিলে টের পাওয়া যায় যে, শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই; সময় মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতি ঘন্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে, 'আর কেহ জাগুক না জাগুক, আমি জাগিয়া আছি।' কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। আমার চোখে তন্দ্রা আসিতেছে।

॥ কাবুলিওয়ালা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার পাঁচবছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকাল বেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দারোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিছু জানে না। না?"

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞান দান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছি মিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয়।"

কহিলাম, "মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর্‌গে যা। আমার এখন কাজ আছে।"

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম' খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চন-

মালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"

ময়লা-ঢিলা-কাপড়-পরা, পাগড়ি–মাথায়, ঝুলি-ঘাড়ে, হাতে গোটাদুইচার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে দেখিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলিঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ওই ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন; তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভাল হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুশ, ইংরেজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার লেড়কী কোথায় গেল।"

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁসিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির

দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস, খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনিভাবে গেল।

কিছুদিন পরে, একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে-মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁসলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এসব কেন দিয়াছ? অমন আর দিয়ো না।" বলিয়া, পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত-চকচকে-গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধুলি কোথায় পেলি?"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি?"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাইনি, সে আপনি দিলে।"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত

আছে, যথা রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে-হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী?"

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে-হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে, এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশী সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না!"

বাঙালীর ঘরের মেয়ে আজন্মকাল 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে, শিশু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এই জন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে?"

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে।"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোনো এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী-পর্বত-অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয় এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এই জন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর-দুর্গম-দগ্ধ-রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে, পাগড়িপরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের 'পরে, কেহ বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চকমকিঠোকা বন্দুক—কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়ীটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর, ডাকাত, মাতাল, সাপ, ম্যালেরিয়া, শুঁয়াপোকা, আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, "কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি করা যায় না? কাবুলদেশে কি দাসব্যবসা প্রচলিত নাই? একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব?"

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু, অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এই জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ী

বাড়ী ফিরিতে হয়, কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না, সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে ; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেটালা-জামা-পায়জামাপরা, সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন দেখি মিনি 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া হাসিতে-হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রুফশীট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দিন-দুইতিন হইতে শীতটা খুব কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হী-হীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে--- মাথায় গলাবন্ধজড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমনসময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে---তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী ?

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া, জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত---মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে-করিতে রহমত এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে, 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে-ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে ?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সসুরাকে মারিতাম, কিন্তু, কি করিব, হাত বাঁধা।"

সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমতো নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক, তাহা তাহার বাপকে স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সখার পরিবর্তে একটি-একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমন কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতন ধৌত-রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মতো রং ধরিয়াছে। কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর-অপরিচ্ছন্ন-ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ীগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগতময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ীর ঘরে-ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁক-ডাকের সীমা নেই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কি রে রহমত, কবে আসিলি।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল। কোনো খুনীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়ীতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।"

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতঃস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের

কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন কি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, "আজ বাড়ীতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময় দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।

"বাবু, তোমার যেমন একটি লেড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লেড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু-কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"

এই বলিয়া, সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একটুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল

ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম---তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলিপরা, কপালে-চন্দনআঁকা, বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ী যাবে?"

মিনি তখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন সে আর পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে। তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে---তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকাল বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতর বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।"

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমনি করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

॥ বর্তমান যুগ ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি পূর্বেই একটা কথা তোমাদিগকে বলেছি—তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড় কাল, এর অভ্যন্তরে কী প্রচ্ছন্ন আছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব অল্পই এসেছে। কেবল আমাদের দেশে নয়। পৃথিবী জুড়ে এক উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। বিশ্বমানব-প্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে—সবাই আছে জাগ্রত। পুরাতন, জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জন্য, সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করবার জন্য, মানব মাত্রেই উঠে পড়ে লেগেছে—নূতন ভাবে জীবনকে, দেশকে গড়ে তুলবে। বসন্ত এলে বৃক্ষ যেমন করে তার দেহ হতে শুষ্ক পত্র ঝেড়ে ফেলে নব পল্লবে সেজে উঠে, মানব-প্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করে সেজে ওঠবার জন্য ব্যাকুল। মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছে, একে এখন কোনমতেই বাইরের শক্তি দ্বারা চেপে ছোটো করে রাখা চলবে না।

আসল জিনিষটা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্তও অস্বীকার করে বসি। আজ আমরা বাহির হতে দেখছি চারিদিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাকে আমরা পলিটিক্স (Politics) বলি। তাকে যত বড় করেই দেখি না কেন, সে নিতান্তই বাইরের জিনিস। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করছে সত্য হয়, তবে তা ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধর্মের মূল শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করেছে বলেই আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না ; পলিটিক্সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখে থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না। কিন্তু বস্তুত ভগবান যে মানবসমাজকে ধর্মের ভিতর দিয়ে একটা মস্ত নাড়া দিয়েছেন এই তো বিংশ শতাব্দীর বার্তা। বিশ্বাস করো,

অনুভব করো, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়ে আজ এই ধর্মের বৈদ্যুতিকশক্তি ছুটে চলেছে। পৃথিবীতে আজ যে কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে তার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসবে না। আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকবার দিন? তন্দ্রা কি ছুটবে না? আকাশ হতে যখন বর্ষণ হয়, ছোটো বড়ো যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মঙ্গলের আধার পূর্ব হতে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানেই তা কল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সার্থকতা আজ সহজ হয়ে এসেছে; এমন সুযোগকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। তোমরা আশ্রমবাসী এই শুভযোগে আশ্রমকে সার্থক করে তোলো। প্রস্তরের উপর দিয়ে জলস্রোত যেমন করে বহে যায়, সেখানে দাঁড়াবার কোনোই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়ে তেমনি করে এই প্রবাহ যেন বহে না যায়! ইশ্বরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত হবার সময় এখানে এসে একবারটি যেন পাক খেয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে! শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমই কেন, পৃথিবীর যেখানে যে কোন ছোটো বড়ো সাধনার ক্ষেত্র আছে মঙ্গল-বারিতে আজ পূর্ণ হোক। আশ্রমে বাস করে এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হতে দিও না। এখানে কি শুধু তুচ্ছ কথায় মেতে, হিংসা দ্বেষের মধ্য থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে দিন কাটাতে এসেছ? শুধু পড়া মুখস্ত করে, পরীক্ষা পাশ করে, ফুটবল খেলে, এতবড়ো জীবনকে নিঃশেষ করে দেবে? কখনোই না—এ হতে পারে না। এই যুগের ধর্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক।

তপস্যার দ্বারা সুন্দর হয়ে তোমরা ফুটে ওঠো। আশ্রমবাস তোমাদের সার্থক হোক। তোমরা যদি মনুষ্যত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করে ধরে না রাখ, শুধু খেলাধূলা-পড়াশুনার ভিতর দিয়েই যদি জীবনকে চালিয়ে দাও, তবে যে তোমাদের অপরাধ হবে, তার আর মার্জনা নেই ,কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি, তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে এসেছ, ভালো করে সেই কালের বিষয় ভেবে দেখো। বর্তমান কালের একটা সুবিধা এই, বিশ্বের মধ্যে যে-চাঞ্চল্য উঠেছে একই সময়ে সকল দেশের লোক তা অনুভব করছে। পূর্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠলে অন্য স্থানের লোকেরা তার কোনই খবর পেত না।

প্রত্যেকটি দেশ স্বতন্ত্র ছিল। এক দেশের খবর অন্য দেশে গিয়ে পৌঁছোবার উপায় ছিল না। এখন আর সে দিন নেই। দেশের কোনো স্থানে ঘা লেগে তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ শুধু দেশের মধ্যে নয়, সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তীরের মতো ছুটে চলে। আমরা সকলে এক হয়ে দাঁড়াই। কত দিক হতে আমরা বল পাই ; সত্যকে আঁকড়ে ধরবার যে মহা নির্যাতন তাকে অনায়াসেই সহ্য করতে পারি ; নানাদিক হতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদনা এসে জোর দেয়—এ কি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলে মনে করি না। এই তো মহা সুযোগ। এমন দিনে আশ্রমবাসের সুযোগকে হারিও না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয় আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—ক্ষতি তোমাদেরই। গাছ ভরে বউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত ঝড়ে পড়ে, শুকিয়ে যায়। তবু ফলের অভাব হয় না। ডাল ভরে ফল, ফলে ওঠে। ফল হল না বলে গাছ দুঃখ করে না। দুঃখ, ঝরা বউলের ; তারা যে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে পারল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হতেছিল, বৃক্ষগুলি যখন ধীরে-ধীরে আলোর দিকে মাথা তুলে ধরেছিল, তখনও নূতন যুগের কোনই সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌঁছায় নি। অজ্ঞাতসারেই আশ্রমের ঋষি এই যুগের জন্য আশ্রমের রচনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ; তখনও বিশ্বমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নি ; শঙ্খ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। বিশ্বশতাব্দীর জন্য বিশ্বদেবতা গোপনে-গোপনে কী যে এক বিপুল আয়োজন করেছিলেন, তার লেশমাত্রও আমরা জানতুম না। আজ সহসা মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল—আমাদের কী পরম সৌভাগ্য! আজ বিশ্বদেবতাকে দর্শন করতেই হবে। অন্ধ হয়ে ফিরে গেলে কিছুতেই চলবে না। আজ প্রকাণ্ড উৎসব; এই উৎসব একদিনের নয়, দু'দিনের নয়—শতাব্দী ব্যাপী উৎসব। একদিনের এই উৎসব কোন বিশেষ স্থানের নয়, কোনো বিশেষ জাতির নয়। এই উৎসব সমগ্র মানবজাতির জগত-জোড়া উৎসব। এস আমরা সকলে একত্র হই, বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোনো রাজার যখন আগমন হয় তাঁকে দেখবার জন্য যখন পথে বাহির হয়ে আসি তখন মলিন, জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তখন নবীন বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের রাজা নন, সমগ্র

জগতের রাজা এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। নত করো উদ্ধত মস্তক। দূর করো সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জনা। মনকে শুভ্র করে তোলো। শান্ত হও, পবিত্র হও। তাঁর চরণে প্রণাম করে গৃহে ফেরো। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্বাদ ঢেলে দিন—মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।

॥ স্বদেশপ্রেম ॥

স্বামী বিবেকানন্দ

আমি স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করিতে হইলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক হয়। প্রথমত হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে; প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ! হে ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে-প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি-কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে-প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত-গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ, এই ভাবনায় কি নিদ্রা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায়-শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে, এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম-যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও, তোমরা স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।

মানিলাম, তোমরা দেশের কথা প্রাণে-প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীকে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি? কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্বতপ্রায় বিঘ্ন-বাধাকে

তুচ্ছ করিয়া কার্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তোমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য ঠাওরাইয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? রাজা ভর্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন —"নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা যুগান্তরেই হউক, তিনিই ধীর; যিনি সত্য হইতে একবিন্দুও বিচলিত হন না!" সেইরূপ, নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি দৃঢ়ভাবে তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখ এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতি ধারণ করিবে। তোমরা যদি পর্বতের গুহায় যাইয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্বত-প্রাচীর পর্যন্ত ভেদ করিয়া বাহির হইবে। হয়তো শত-শত বর্ষ ধরিয়া উহা কোন আশ্রয় না পাইয়া সূক্ষ্মাকারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিবে। কিন্তু একদিন না একদিন উহা কোন-না-কোন মস্তিষ্ক আশ্রয় করিবেই করিবে। তখন সেই চিন্তানুযায়ী কার্য হইতে থাকিবে। অকপটতা, সাধু অভিসন্ধি ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।

॥ স্বদেশ রক্ষা ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

রাণা। কে? গোবিন্দসিংহ? এ সময়ে হঠাৎ?

গোবিন্দসিংহ। রাণা! মেবার আক্রমণ করবার জন্য নূতন মোগলসৈন্য আবার এসেছে।

রাণা। এসেছে ত? তা পূর্বেই জানতাম গোবিন্দ সিংহ। এক মেবারে এ-যুদ্ধ শেষ হবে না। মোগল সমস্ত রাজপুতানা সমভূমি না করে ছাড়বে না।

গোবিন্দ। আমাদের পক্ষে এখনও যুদ্ধের আয়োজন নাই কেন রাণা?

রাণা। প্রয়োজন?

গোবিন্দ। রাণা কি আর যুদ্ধ করবেন না?

রাণা। যুদ্ধ!—কি হবে?

গোবিন্দ। সে কি রাণা? মোগল এবার তবে নির্বিবাদে এসে মেবার অধিকার করবে!

রাণা। মন্দ কি? যখন তার এত আগ্রহ!

গোবিন্দ। রাণা সত্য সত্যই কি যুদ্ধ করবেন না?

রাণা। না---একবার করেছি---করেছি।

গোবিন্দ। একটা চেষ্টা, একটা উদ্যম, একটা প্রতিবাদও না করে---

রাণা। প্রয়োজন? আমি বুঝতে পাচ্ছি যে তা নিষ্ফল! মেবার যুদ্ধে আমরা অনেক রাজপুত হারিয়েছি। মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ যে করব—সে সৈন্য কৈ?

[সত্যবতীর প্রবেশ]

সত্য। মাটি ফুঁড়ে উঠবে মহারাণা।

রাণা। কে? চারণী?

সত্য। হাঁ, রাণা। আমি চারণী। শুনলাম, মোগল আবার আক্রমণ

করতে এসেছে। দেখ্‌লাম, এখনও মেবার নিশ্চিত উদাসীন। ভাব্‌লাম, রাণার বুঝি এখনও ঘুম ভাঙে নাই। আমি রাণার ঘুম ভাঙাতে এলাম।

রাণা। চারণী! আমার আর যুদ্ধ করবার ইচ্ছে নেই! এবার সন্ধি করব।

সত্য। সে কি মহারাণা! এ মেবারের জয়ের পর সন্ধি? এই মহৎ গৌরবের শিখর হতে এক ঝাঁপে গভীর অপমানের কূপে নেমে যেতে হবে?

রাণা। মেবার জয় চারণী! আমরা মেবারে জয়লাভ করেছি বটে—কিন্তু জান কি দেবী?—জান কি, যে এই মেবার যুদ্ধে আমরা অর্ধেক সৈন্য হারিয়েছি; কত যে বীরের রক্ত দিয়ে আমরা সে জয় ক্রয় করেছি? কিন্তু আমি দেখছি, যে আর একটি যুদ্ধ করলেই হবে না—এ সমরের অন্ত নেই। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্বজয়ী দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অবিমিশ্র উন্মত্ততা।

সত্য। উন্মত্ততা, রাণা? তাই যদি হয়—তবে এ-উন্মত্ততার স্থান সব বিবেচনা বিচারের বহু উর্ধ্বে। নিখিলবিশ্ব এসে এই উন্মত্ততার চরণতলে লুটিয়ে পড়ে। স্বর্গ হতে একটা গরিমা এসে এই উন্মত্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়। উন্মত্ততা? উন্মত্ত না হ'লে কেউ কোন কালে কোন মহৎ কাজ করতে পেরেছে?

রাণা। কিন্তু, সে যুদ্ধের শেষ ফল নিশ্চিত মৃত্যু—

সত্য। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে, কোন্‌টি শ্রেয়—অধীনতা, না, মৃত্যু? মরবার ভয়ে আমার রত্ন দস্যুর হাতে সঁপে দেবো? আর এ—যে-সে রত্ন নয়—আমার যথাসর্বস্ব, আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর স্মৃতিস্নাত মেবারকে প্রাণভয়ে, বিনাযুদ্ধে শত্রুকরে সঁপে দেবো? তারা নিতে চায় ত মেরে কেড়ে নিক। নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলেরই নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে রাণা কি প্রাণটা চিরকাল রাখতে পারবেন?—উঠুন রাণা। মোগল দ্বারদেশে! আর স্বপ্ন দেখবার সময় নাই!

রাণা। চারণী! তুমি কে? তোমার বাক্যে গর্জন, তোমার চক্ষে বিদ্যুৎ, তোমার অঙ্গভঙ্গীতে ঝটিকা। সূর্যের মত ভাস্কর, জলপ্রপাতের মত প্রবল, বজ্রের মত ভীষণ—কে তুমি? তুমি ত শুদ্ধ চারণী নও।

সত্য। কে আমি? শুনুন তবে, কে আমি, গোপন করার প্রয়োজন নেই। আমি রাণা প্রতাপসিংহের ভাই সগরসিংহের কন্যা, সত্যবতী!

রাণা। তুমি রাজা সগরসিংহের কন্যা! সে কি?

সত্য। সে পরিচয় দিতে আজ লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। তবে পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ কন্যার যতদূর সাধ্য সে তা করছে। আমার পিতা আজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য চিতোর দুর্গে কল্পিত রাণা হয়ে বসেছেন। আর আমি তাঁরই কন্যা আবার তাঁরই বিরুদ্ধে এই মেবার-বাসীদের উত্তেজিত করে বেড়াচ্ছি; তাদের বলে বেড়াচ্ছি যে, এই সগরসিংহ মেবারের কেহ নয়, তিনি মোগলের ক্রীতদাস। জানেন রাণা—আজ পর্যন্ত মেবারের একটি প্রাণীও পিতাকে কর দেয় নাই!

রাণা। জানি ভগিনী।

সত্য। রাণা! মেবারের জন্য আমি আমার সৌধ, সম্ভোগ, পিতা-পুত্র ছেড়ে, তার কানন-উপত্যকায় চারণী সেজে, তার মহিমা গেয়ে বেড়াচ্ছি, আর আমার সেই সাধের মেবারকে তুমি একটা অতিরিক্ত কুক্কুরশাবকের ন্যায় বিলিয়ে দেবে!—

[বলিতে-বলিতে সত্যবতীর চক্ষে জল আসিল, কন্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি চক্ষু মুছিলেন।]

রাণা। শান্ত হও ভগিনী! তুমি আমার ভগ্নী, নারী, রাজকন্যা। তুমি যে-দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পার, সে-দেশের রাজা, তার ভাইও—তার জন্য প্রাণ দিতে পারে। গোবিন্দসিংহ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। সৈন্য সাজাও।

॥ ঊষা ও সন্ধ্যা ॥

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলন-দৃশ্য বড় চমৎকার। বিশেষতঃ দুইটি বিপরীত বস্তুর মিলন অতি সুন্দর। দুই জিনিষেরই সৌন্দর্যটুকু ফুটিয়া উঠে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য বিরাজ করে। আলো ও অন্ধকার দুইটি বিভিন্ন বস্তু। দুইটি পরস্পরের ঠিক বিপরীত। ঊষায় ও সন্ধ্যায় এই দুই জিনিষের মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।

বেশভূষাতেও সন্ধ্যা ও ঊষার মধ্যে কেমন একটা ঐক্য আছে। ঊষা সিন্দুর পরে---সন্ধ্যাও সিন্দুর পরে। ঊষার রক্তিম অধরে হাসি উথলিয়া উঠে---সন্ধ্যারও রক্তিম অধরে হাসি মাখানো ; কিন্তু উভয়ের হাসি যেন এক নয়। দুই জনের হাসি দুই রকমের। এক জনের হাসি কতকটা যেন বালিকার মত। ঊষা বালিকা। সন্ধ্যার হাসি যেন কিছু গম্ভীর।

সন্ধ্যা ঊষার মত নিতান্ত ছোট মেয়ে নয়। সে সংসারের কাজকর্ম সারিয়া দু'দণ্ড ছাতে বসিয়া থাকে। আবার খানিক পরে ধীরে-ধীরে গৃহে ফিরিয়া যায়। সন্ধ্যার সিন্দুর-রাগে সন্ধ্যাকে সধবা বলিয়া মনে হয়। ঊষার সিন্দুররাগ দেখিলে মনে হয়, ঊষা এখনও কুমারী। যেন দিদির কৌটা হইতে খানিকটা সিন্দুর লইয়া ললাটে পরিয়াছে।

ঊষা বসন্তের হাসির টুকরার মত ছুটাছুটি করিতে-করিতে আসে, ছুটাছুটি করিয়া যায়। সে জগৎকে মালা গাঁথিয়া পরাইবার জন্য আঁচল ভরিয়া কত ফুল পাড়িয়া আঁচল ভরিয়া ফেলে। সহসা ফুলগুলি তুলিতে সন্ধ্যার কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়। শুভ্র হাসির মত স্বর্গের ফুলগুলিকে সে কেমন করিয়া তুলিবে—কেমন করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গের শান্তি হইতে মর্ত্যের কোলাহলে লইয়া আসিবে ?

ফুলেরা দুটি বোনকে বড় ভালবাসে। দুটি বোনের কাছে থাকিতে পারিলে তাহারা আর কিছুই চাহে না। ঊষা তাহাদের লইয়া খেলা করে বলিয়া তাহাদের

কত আনন্দ। সন্ধ্যাকেও তাহারা প্রাণের মত ভালবাসে। পাছে মর্ত্যের কোলাহলে তাহাদের স্বর্গের শান্তি ডুবিয়া যায়, এই ভাবিয়া সন্ধ্যা তাহাদিগকে সহজে আনিতে চাহে না; কিন্তু তাহারা সন্ধ্যার সঙ্গে না আসিয়া থাকিতে পারে না। সন্ধ্যা কাজেকাজেই অতি সন্তর্পণে তাহাদিগকে লইয়া আসে।

উষাকে আমরা স্নেহ করি। সে প্রত্যহ আমার বিছানার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়—তাহার কচি-কচি হাত দু'খানি দিয়া আমাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দেয়। আমার ঘুম ভাঙিলেই উষা ক্রমে-ক্রমে সরিয়া যায়। অনেক ডাকাডাকি করিলেও সেদিন আর ফেরে না।

সন্ধ্যা যেন কতকটা আমাদের সুখ-দুঃখের কথা বুঝে; সন্ধ্যার সঙ্গে আমরা কত কি সাংসারিক কথাবার্তা কই। জীবনটা কি রকমে কাটিবে, জীবনের দশা কি হইবে, এই বিষয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়। সন্ধ্যা সংসারের সব বেশ বুঝে। সন্ধ্যা আমাকে উপদেশ দেয়—অনেক শিক্ষা দেয়।

সন্ধ্যা গোলাপ ফুল—তাহার হাসিখানি গোলাপের মত; উষা শিউলি ফুল—তাহার হাসিটি শিউলির মত।

॥ আবহাওয়া ॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেকালের আবহাওয়া একালে বদলে গেছে; এখনকার মানুষই যেন অন্য রকম হয়ে জন্মাচ্ছে। সে মজলিস নেই, মজলিসি লোকও নেই। কিন্তু সেকালে আমাদের কি ছিল? এই বাড়ীতেই দেখেছি, যখন যেখানে যেমনটি প্রয়োজন ঠিক তেমনটি পাওয়া যেত; সব যেন আগে থেকে তৈরী হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক হিসেবে সঙ্কীর্ণতায় প্রাণবস্তুর কাটছাট তখনও সুরু হয়নি। নানা প্রয়োজন এবং বাহুল্যের সরবরাহ করে মজলিসকে বাঁচিয়ে রাখা যাদের কাজ ছিল, সেই চাকরবাকররাও ছিল তেমনই, মজলিসের রস তাদেরও ছুঁয়ে যেত। আজকাল মজলিস নাম দেয় বটে, কিন্তু তাতে মজলিসত্ব কিছু নেই; তফাত বুঝতে পারি না—আনন্দ-সভায় আর শোক-সভায়ঃ সেই সভাপতি, সেই উদ্বোধন-সঙ্গীত, সেই বক্তৃতা, সেই সমাপ্তি-সঙ্গীত। সবই আছে, মজলিসের প্রাণটুকুই নেই।

সেকালের বৈঠকেরও এই দুর্গতি হয়েছে। সে-আমলে এই মজলিস আর বৈঠক ছিল সত্যি, জীবন্ত; আমরাও তার শেষের রেশটুকু দেখেছি। ও বাড়ীতে বসত বড় জ্যেঠামশাইদের বৈঠক সকালে; বাবামশাই, বড় জ্যেঠামশাই সবাই বসতেন দক্ষিণের বারান্দায়। বড় জ্যেঠামশাই 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখছেন, তাই নিয়ে অবিরত চলছে সাহিত্য-আলোচনা; দার্শনিকেরা আসতেন, নিজের নিজের সট্‌কা নিয়ে আসর জমিয়ে সবাই বসতেন; অবাধে বইত সাহিত্যের হাওয়া। ছেলেবেলায় উঁকিঝুঁকি মেরে আমিও দেখেছি এই বৈঠকের চেহারা।

সন্ধ্যেয় বসত জ্যোতিকাকামশাইদের বৈঠক। এ-বৈঠকের চেহারা ছিল আর এক রকম, সেখানে আসতেন তারক পালিত, ছোট অক্ষয়বাবু, কবি বিহারী-লাল। রবিকা' বয়সে ছোট হলেও এই বৈঠকে যোগ দিতেন। এখানে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন কাকিমা অর্থাৎ জ্যোতিকাকার স্ত্রী

ছিলেন এই বৈঠকের কর্ত্রী। এখানে চলত গান, বাজনা, কবিতার পর কবিতা পাঠ।

এ বাড়ীতে বাবামশাইয়ের ছিল আলাদা বৈঠক। এখানে পাড়া-পড়শিরা এসে বসত, তামাক, গান-বাজনা, খোশগল্প চলত। অক্ষয় মজুমদার টপ্পা গাইতেন, অম্বুরি তামাকের গন্ধে আসর মাত হয়ে থাকত। সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

সে যুগের তিন রকম মজলিসের ছবি দিলুম। এই আবহাওয়ার মধ্যে রবিকা' বড় হয়েছেন। তখন সব দিকে সামঞ্জস্য বজায় ছিল, শিল্প-সাহিত্য-গানের অফুরন্ত বিকাশের মধ্যে তিনি মানুষ। সে যুগের এমন বিদ্বদ্জনসমাগম আর কোথাও হত না। বঙ্কিমবাবু আসতেন। মনে আছে একবার রবিকা'র 'কালমৃগয়া' নাটকটি আগাগোড়া গান গেয়ে তাঁকে শোনানো হয়েছিল। আবছা মনে পড়ছে আমাদের উপর ভার ছিল ফুলদানি সাজাবার। সহবৎদুরস্ত ভাল কাপড়জামা পরে হাজির হবার হুকুম ছিল আমাদের উপর। একালের মত এলোমেলো অগোছালোভাবে ছেলেরা যেখানে-সেখানে যেতে পারত না। এই জীবনযাত্রার মধ্যে যিনি মানুষ, তিনি যে সকলবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা দেখাবেন, সে আর বিচিত্র কি? আমাদের এই বাড়ীর জীবনযাত্রা পুরাতন চালে অনেক দিন চলেছিল। আমাদের আমলেও এর জের ছিল কিছু। তারপর আস্তে-আস্তে আজকালকার ক্লাবের সৃষ্টি হল, পুরাতন চাল বিদায় নিলে।

যেমন বাইরে, অন্দরমহলেও তেমনই। দেখেছি গুরুজনদের সম্পর্কে সমীহ করে চলার রেওয়াজ; খাওয়া-দাওয়া, সাজপোশাকে তাঁদেরও একটু বে-চাল হওয়ার জো ছিল না।

একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। অরুদা একবার চা-বাগান থেকে ফিরে এলেন, একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব—কোট-প্যান্ট-হ্যাট-টাই, কুলি খাটিয়ে মেজাজও হয়েছে সাহেবি। ইংরেজ ফ্যাশন-দুরস্ত সাজ পরে তিনি একদিন বাইরে বেরুচ্ছেন, দেউড়ির বাইরে এসেছেন, উপরের বারান্দা থেকে বড় জ্যোঠামশাইয়ের নজরে পড়ে গেলেন। অমনই শুরু হল হাঁকডাক। জ্যোঠামশাই উপর থেকেই বললেন, "অরু, এই অভব্য বেশে তুমি চলেছ রাস্তায়?"

একটা বিপর্যয় ব্যাপার ঘটে গেল। চাকর ছুটল, দারোয়ান ছুটল, অরুদার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। সাজ-পোশাকের দস্তুর তখন মেনে চলতেই হত--- এক জোটে বেরুনো বারণ ছিল। বে-আইনি পোশাকে ছোট ছেলেদেরও কাউকে যদি সদরে দেখা যেত, অমনই তলব পড়ত চাকরদের, কঠিন শাস্তি পেতে হত তাদের। আজ আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি লুঙি পরে বসে আছি, আমাদের ছেলেরা হ্যাট-কোট পরছে!

যা বলছিলুম। ইদানীং দেখছি, সব তফাৎ হয়ে গেছে। ছোটখাট স্মৃতি-সভা, টাউনহলের সভা, গান-বাজনার আসর; সবই যেন একরম। বিয়ের বাসর আর মৃত্যুবাসর সবই এক। এগুলো আমাদের বড় চোখে লাগে। রবিকা'কে একবার বলেছিলুম, 'রবিকা' একটা ব্যবস্থা কর দেখি, এরকম তো আর দেখতে পারিনে। সব অনুষ্ঠানগুলো তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে গেল!' তিনি জবাব দিলেন না, চোখ বুজে রইলেন। রবিকা' এই যে ঋতুতে-ঋতুতে উৎসব করতেন, তাঁর মনের মধ্যে ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ঠিক রূপটি ধরা পড়ত। শান্তিনিকেতনেও যে অনুষ্ঠান হত, তার সমস্ত আয়োজন তাঁর ব্যবস্থা মত হত। কার পর কি হবে, কোথায় কি থাকবে, কে কোথায় বসবে, আগে থাকতে সব ছকে দিতেন। একবার কলকাতাতে তাঁর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির শিল্পীরা ওঁকে সম্বর্ধনা করেছিল। উৎসবের একটা ভাল রকম ব্যবস্থার জন্য আমি ওঁকেই গিয়ে ধরলুম। সমস্ত অনুষ্ঠানের এমন একটা ছাপ দিয়ে দিলেন যে, বিস্মিত হতে হল। এই আমাকেই চেলির জোড় পরিয়ে ক্ষিতিমোহনবাবুর বাছাই করা বৈদিকমন্ত্র পড়িয়ে তবে ছাড়লেন। আমি নিজে শিল্পী হয়ে তাঁর শিল্প ও সুষমা বোধের পরিচয় পেয়ে অবাক না হয়ে পারলুম না। এখন বুঝতে পারি এইসব অনুষ্ঠান ঠিক-ঠিক করবার জন্য কর্তার যে-শক্তি দরকার তা তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে-সঙ্গে শক্তিও বিদায় নিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, বাংলা দেশ থেকে অনুষ্ঠান জিনিসটাও বিদায় নেবে।

রবিকা' কোন জিনিস এলোমেলো অগোছালোভাবে হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না---এই শিক্ষা তিনি পুরোনো যুগের আবহাওয়া থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কোন অনুষ্ঠানে পান থেকে চূন খসবার জো ছিল না। সব ঠিক ঠিক হতেই হত।

রবিকা'র সঙ্গে-সঙ্গে এই সব অনুষ্ঠান, পুরানো যুগের সব স্মৃতি বিদায় নিলে। রবিকা' বলতেন, 'দেখ, আমরা চলতে-বলতে একভাবে শিখেছিলুম, তাই এ যুগের লোকের সঙ্গে আর তাল মেলাতে পারি নে।' তিনি মুখে একথা বললেও নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল এবং তাঁর জীবনে তাল না মেলাবার দুঃখ তাঁকে পেতে হয়নি। পুরাণো আনুষ্ঠানিক আবহাওয়া তিনি যথাযথ বজায় রেখেছিলেন তাঁর সব অনুষ্ঠানের মধ্যে। নিজের জোরে নতুনের সঙ্গে পুরাতনকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

।। মাষ্টার মহাশয় ।।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আগামী বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে যখন গোঁসাইগঞ্জ গ্রামের তিন জন প্রধান ব্যাক্তির মধ্যে গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময়ে রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পৌছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হীরু দত্ত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মোড়লের পো, অমন করে বসে পড়লে কেন? কি হয়েছে?"

রামচরণ দুইচক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল, "কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা, কি হ'তে আর বাকি আছে? হায়-হায়-হায়,—কর্তিক মাসে যখন আমার জ্বরবিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি হারে বিধাতা, তোর পোড়া কপাল!"

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন। দত্তজা বলিলেন, "কি হয়েছে? সব কথা খুলে বল। এখন আসছ কোথা থেকে?"

দীর্ঘশ্বাসজড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, "নন্দীপুর থেকে। হায় হায়, শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল! হা-রে কপাল!" বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল। দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন? নন্দীপুর গোয়ালারা কি করেছে?"

"বলছি। বলবার জন্যেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক কোশ পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্চে না। এক ঘটি জল—"

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল এবং একটি ঘটি আসিল। রামচরণ

উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ পানও করিল। তারপর হাত-মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল।

হীরু দত্ত বলিলেন, "এবার বল, কি হয়েছে, আর দগ্ধে মেরো না বাপু!"

রামচরণ বলিল, "কি হয়েছে? যা হবার নয়, তাই হয়েছে। বড় বড় শহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এই সব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নেও ভাবে নি, তাই হয়েছে। তারা হস্কুল বসিয়েছে।"

তিনজনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আবার? হস্কুল কি?"

রামাচরণ বলিল, "আরে ছাই, আমি কি জানতুম আগে হস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম! ইংজিরি পড়ার পাঠশালাকে হস্কুল বলে।"

দত্তজা বলিলেন, "ওঃ, ইস্কুল খুলেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তাই খুলেছে। একজন ম্যাষ্টার নিয়ে এসেছে। ইংজিরি পাঠশালের গুরুমশাইকে নাকি ম্যাষ্টার বলে। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে হস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম, ম্যাষ্টার বসে দশবারোজন ছেলেকে ইংজিরি পড়াচ্চে।"

হীরু দত্ত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম্যাষ্টার কোথা থেকে এসেছে, তা কিছু শুনলে?"

"সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্ধমান থেকে এসেছে। বামুনের ছেলে—হারাণ চক্রবর্তী। পনের টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।"

বাহিরে এই সময়ে একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, তিল তিল করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব পরাভব সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চিৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল, "একি সর্বনাশ হল। নন্দীপুরের হাতে এই অপমান! আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হবে?"

হীরু দত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"ভাই সকল! তোমরা কি মনে করেছ, তিনপুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হেরে যাবে? কখনই না। এদেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলব। ওরা বা কি ইস্কুল খুলেছে। আমরা তার চতুর্গুণ ইস্কুল খুলব। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়াদাওয়া করে আমি বেরুচ্চি। কলকাতা যাবার রেল খুলেছে, আর ত কোনও ভাবনা নেই। আমি কলকাতায় গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাষ্টার নিয়ে আসব। ওরা পনের টাকা দিয়ে মাষ্টার এনেছে? আমরা পঁচিশ টাকা মাইনে দেব। ওদের মাষ্টারকে পড়াতে পারে, এমন মাষ্টার আমি নিয়ে আসব। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাব, বসাব, বসাব—তিনসত্যি করলাম। এখন যাও, তোমরা বাড়ী যাও, স্নানাহার কর গে।"

"জয় গোঁসাইগঞ্জের জয়! জয় হীরু দত্তের জয়!"—সোল্লাসে চিৎকার করিতে-করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাস্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর, খর্বকায় কৃশকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজী বলিতে, কহিতে, লিখিতে, পড়িতে তিনি নাকি ভারী ওস্তাদ, ইংরাজীটা তাঁর এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে-করিতে মাঝে-মাঝে ইংরাজী কথা মিশাইয়া ফেলেন—অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থে আবার তাহার বাঙ্গালা করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতার গঙ্গার ধারে মাস্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজী শুনিয়া লাটসাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাটসাহেব মাস্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটি কালেকটরি পদ তাঁকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের ব্যাটা, সংসারের চিন্তা ছিল না। সেই প্রস্তাব তিনি বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে

পড়িয়া এই পঁচিশ টাকার চাকরী তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল! পুরুষস্য ভাগ্যম্!—মাস্টার মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ইংরাজীয়ানা চাল-চলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা অনুসারে, পরদিনই ইস্কুল খুলিল। পনের-ষোলজন ছাত্র লইয়া মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে শ্লেটপেন্সিল ও মরে সাহেবের স্পেলিংবুক পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, ছাত্রগণের উৎসাহ বর্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনামূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথেঘাটে দেখা হইলে, উভয় গ্রামের মাষ্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত—"বর্ধমানের মাষ্টার, ও জানেই বা কি, আর পড়াবেই বা কি!" নন্দীপুর বলিত—"হলেই বা আমাদের মাষ্টারের বর্ধমানে বাড়ী, তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন, তখন কি বর্ধমানে ইংরিজি স্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরিজি পড়তে হ'ত।"

যথাসময়ে উক্ত গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই অপর গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা ও ঢপসঙ্গীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে উভয় মাষ্টারের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্বাবধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন—"ওই ব্যাটা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে, তা এতদিন জানতাম না। ওটা তো মহামূর্খ! ছেলেবেলায় কলকাতায় আমরা এক কেলাসে পড়তাম কি না। আমরা যখন সেকেণ্ড বুক পড়ি, সেই সময়েই ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর তো ইংরেজী পড়েনি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত। মাইনে ছিল সাত টাকা। গেলবছরও তো কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখনও তো ঐ চাকরী করছে।"

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজমাষ্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি শুনছি?"

ব্রজমাষ্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—

"একেই বলে কলিকাল। সেকেণ্ড বুক পড়ার সময়ে আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না, ওই ছেড়ে দিয়েছিল? হয়েছিল কি জান না বুঝি? মাষ্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করত, ও একদিনও বলতে পারত না। মাষ্টার একদিন ওকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে ও এনসার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বললাম। মাষ্টার আমায় বল্লে, 'দাও ওর কান মলে।' আমি কান মলে দিতেই ওর মুখচোখ রাঙা হয়ে গেল। ও বলতে লাগল, আমি হলাম বামুনের ছেলে, ও কায়েৎ হয়ে কিনা আমার কানে হাত দেয়! সেই অপমানে ও-ই ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তারপর পাঁচ-ছ বছর সেই ইস্কুলে পড়ে একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।"

অতঃপর গোঁসাইগঞ্জের লোক, নন্দীপুর কর্তৃক ব্যক্ত ঐ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারাণ মাষ্টার বলিল, "আমরা ইস্কুলে যে মাষ্টারের কাছে পড়তাম, তিনি আজও বেঁচে আছেন; গোঁসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দু'জন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, কার কথা সত্যি, কার কথা মিথ্যে।"

এ কথা শুনিয়া ব্রজমাষ্টার হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "অ্যাঁ! এই কথা বলেছে? ও সব তো বিলকুল ফলসো---মিথ্যে কথা। সেই মাষ্টারের কাছে গিয়ে ভজিয়ে দেবে? তিনি কি আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে হেভেন---স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইনভাইট ---নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি, বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে। একেবারে সন্ ইকোয়েল—পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও আমাকে বেজোদাদা বলতে ইগ্নোরেন্ট---অজ্ঞান।

উভয় মাষ্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব-স্ব মাষ্টারের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুইজনের মধ্যে বিচার হউক। কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচার সভা বসিবে। কিন্তু

উভয় গ্রামের লোকই ইংরাজীতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয়-পরাজয় সম্পর্কে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচার প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মাষ্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরেজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবেন, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়েই তুল্যমূল্য। একজন অপরকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা, স্থান উপরিউক্ত বট-বৃক্ষতল ; সময়—সূর্যাস্ত।

ধার্য দিনে সূর্যাস্তের পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজমাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যকারগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটি বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাকঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাষ্টারের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, "কি হে মাষ্টার, মুখ রাখতে পারবে তো, বেছে-বেছে খুব শক্ত একটা কিছু তৈরী করে রাখ, হারাণ মাষ্টার যেন কিছুতেই তার মানে বলতে না পারে।" ব্রজবাবু বলিলেন, "আপনারা ভাবছেন কেন ? দেখুন না কি করি। এমন কোশ্চেন্ জিজ্ঞাসা করব যে, তা শুনেই হারাণ মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে—মানে বলা তো দূরের কথা।" দত্তজা বলিলেন, দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার, তবে তোমার পাঁচটাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব।" কেহ না বলিলেও ব্রজ মাষ্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে তবে এ গ্রাম কল্যই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষতলে উপনীত হইল। মাদুর, সতরঞ্চ প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্বেই আনিয়া নিজগ্রামের সীমারেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে। দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুরবাসীগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ, মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক-ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে।

ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই-তিন হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবী করিল। কোন পক্ষই নিজ দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া উর্ধ্বে ছুঁড়িয়া দিউন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

"আমার ছড়ি লউন—আমার ছড়ি লউন" বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটা পাইলেন তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।

ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথা নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল। গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চূন হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচারফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হারাণ মাষ্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ মাষ্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার বুকটি দুরু-দুরু করিতে লাগিল ; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

হারাণ মাষ্টার তখন বলিলেন, "আচ্ছা বল দেখি এর মানে কি—

"HORNS OF A DILEMMA"

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাষ্টার এই কূট প্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, "এর মানে—

উভয় সঙ্কট"

—কেমন কিনা।"

"পেরেছে—পেরেছে—আমাদের মাষ্টার পেরেছে"—বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ

তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এখন ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল।

ব্রজ মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"শোন হারাণবাবু, আমি তোমায় কোন কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে; বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। এ অঞ্চলে মনে কর তুমি আর আমি এই দু-জন যা ইংরেজিনবীশ আছে। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে তোমায় ঠকিয়ে দেব, সেটা আমার মনঃপূত নয়। এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারে—কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজনবীশ হয়ে আর একজন ইংরেজিনবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান করতে পারিনে। আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি—বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা এর মানে কি বল দেখি—তুমি জান নিশ্চয়ই—আচ্ছা এর মানে বল—

I DON'T KNOW"

হারাণ মাষ্টার উচ্চৈঃস্বরে বলিল—

"আমি জানি না।"

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুলবেগে নৃত্য ও চিৎকার করিতে লাগিল—"হো হো জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে গেল! দুয়ো—দুয়ো।"

হারাণ মাষ্টার মহা বিপন্নভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গোঁসাইগঞ্জের ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া ও রামশিঙ্গা সমবেত-ভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। তাহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জনিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে-করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং তন্মধ্যে একজন ব্রজ মাষ্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে-করিতে বাদ্য-ভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল হারাণ মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাষ্টারি এবং গ্রামস্থ সকলের অপত্য নির্বিশেষে ক্ষীর-ননী-ছানা ভুঞ্জন করিতে লাগিলেন।

॥ বিন্দুর ছেলে ॥

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)

যাদব মুখুয্যে ও মাধব মুখুয্যে যে সহোদর ছিলেন না, সে কথা নিজেরা ত ভুলিয়াই ছিলেন, বাহিরের লোকও ভুলিয়াছিল। দরিদ্র যাদব অনেক কষ্টে ভাই মাধবকে আইন পাস করাইয়াছিলেন এবং বহু চেষ্টায় ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র সন্তান বিন্দুবাসিনীকে ভ্রাতৃবধূরূপে ঘরে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিন্দুবাসিনী অসামান্যা রূপসী। প্রথম যেদিন সে এই অতুল রূপ ও দশ সহস্র টাকার কাগজ লইয়া ঘর করিতে আসিয়াছিল সেদিন বড়বৌ অন্নপূর্ণার চোখে আনন্দাশ্রু বহিয়াছিল। বাড়ীতে শাশুড়ী-ননদ ছিল না, তিনিই ছিলেন গৃহিণী। ছোটবধূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রতিবাসিনীদের কাছে সগর্বে বলিয়াছিলেন, ঘরে বৌ আন্‌তে হয় তো এম্‌নি! একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। কিন্তু দুইদিনেই তাঁহার এ ভুল ভাঙ্গিল। দুই দিনেই টের পাইলেন, ছোটবৌ যে-ওজনে রূপ ও টাকা আনিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার অভিমানও সঙ্গে আনিয়াছে। একদিন বড়বৌ স্বামীকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, হাঁ গা, রূপ আর টাকার পুঁটলি দেখে বৌ ঘরে আন্‌লে, কিন্ত্র এ যে কেউটে সাপ!

যাদব কথাটা বিশ্বাস করিলেন না। মাথা চুলকাইয়া বার দুই তাই ত, তাই ত, করিয়া কাঁছারি চলিয়া গেলেন।

যাদব অতিশয় শান্ত প্রকৃতির লোক, জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবী এবং ঘরে আসিয়া পূজা অর্চ্চনা করিতেন। মাধব দাদার চেয়ে দশ বার বছরের ছোট, উকিল হইয়া সম্প্রতি ব্যবসা সুরু করিয়াছিল।

সে আসিয়া কহিল, বৌঠান, টাকাটাই কি দাদার বেশি হ'ল? দু'দিন সবুর কর্‌লে আমিও রোজগার ক'রে দিতে পারতাম।

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া রহিলেন।

এ ছাড়া আরও একটা বিপদ এই হইয়াছিল, ছোটবৌকে শাসন করিবারও যো ছিল না। তাহার এম্‌নি ভয়ঙ্কর ফিটের ব্যামো ছিল যে, সেদিকে চাহিয়া দেখিলেও বাড়ীসুদ্ধ লোকের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিত থাকিত এবং ডাক্তার না ডাকিলে আর উপায় হইত না। সুতরাং সাধের বিবাহটা যে ভুল হইয়া গিয়াছে, এই ধারণাই সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল, শুধু যাদব হাল ছাড়িলেন না। তিনি সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, না গো না, তোমরা পরে দেখো। মায়ের আমার অমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, সে কি একেবারে নিষ্ফল যাবে? এ হ'তেই পারে না।

একদিন কি একটা কথার পরে ছোটবৌ মুখ অন্ধকার করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া ভয়ে অন্নপূর্ণার প্রাণ উড়িয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার কি মনে হইল, ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার দেড় বছরের ঘুমন্ত ছেলে অমূল্যচরণকে টানিয়া আনিয়া বিন্দুর কোলের উপর নিক্ষেপ করিয়াই তিনি পলাইয়া গেলেন।

অমূল্য কাঁচাঘুম ভাঙিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বিন্দু প্রাণপণ বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া মূর্ছার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ছেলে বুকে করিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলেন এবং ফিটের ব্যামোর এই অমোঘ দৈব-ওষধ বাহির করিয়া পুলকিত হইলেন।

সংসারের সমস্ত ভার অন্নপূর্ণার মাথায় ছিল বলিয়া, তিনি ছেলে মানুষ করিতে পারিতেন না। বিশেষ, সমস্ত দিনের কাজ-কর্মের পর রাত্রে ঘুমাইতে না পাইলে তাঁহার বড় অসুখ করিত, তাই এই ভারটা ছোটবৌ লইয়াছিল।

মাসখানেক পরে সকালবেলা সে ছেলে কোলে লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, অমূল্যধনের দুধ কই?

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা ফেলিয়া রাখিয়া ভয়ে-ভয়ে বলিলেন, এক মিনিট সবুর কর্ বোন, জ্বাল দিয়ে দিচ্ছি।

বিন্দু ঘরে ঢুকিয়াই দুধ জ্বাল হয় নাই দেখিয়াই রাগিয়া গিয়াছিল, তীক্ষ্ণ কন্ঠে বলিল, কালও তোমাকে বলেছি, আমার আট্‌টার আগে দুধ চাই, তা সে ত

ন টা বাজে! কাজটা তোমার যদি এতই ভারী ঠেকে দিদি, স্পষ্ট ক'রে বল্‌লেই তো পারো আমি অন্য উপায় দেখি। হাঁ বামুনমেয়ে, তোমারও কি একটু হুঁস থাকতে নেই গা, বাড়ীসুদ্ধ লোকের পিণ্ডিরান্না না হয় দু'মিনিট পরেই হ'ত?

বামুন ঠাকরুণ চুপ করিয়া রহিলেন। অন্নপূর্ণা বলিলেন, তোর মত শুধু ছেলেকে টিপ পরানো আর কাজল দেওয়া নিয়ে থাকলে আমাদেরও হুঁস থাক্‌ত। এক মিনিট আর দেরী সয় না ছোটবৌ?

ছোটবৌ তাহার উত্তরে বলিল, তোমার অতি বড় দিব্যি রইল, যদি কোনদিন আর অমূল্যর দুধে হাত দাও, আমারও দিব্যি রইল, আর কোনদিন যদি তোমাকে বলি।

এই বলিয়া সে মেঝের উপর অমূল্যকে দুম্ করিয়া বসাইয়া দিয়া, দুধের কড়া তুলিয়া আনিয়া উনানের উপর চড়াইয়া দিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে অমূল্য চীৎকার করিয়া উঠিতেই, বিন্দু তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, চুপ কর্ হতভাগা, চুপ কর, চেঁচালে একেবারে মেরে ফেল্‌ব। বিন্দুর ব্যাপারে বাড়ীর দাসী কদম ছুটিয়া অসিয়া খোকাকে কোলে লইতে গেলে বিন্দু তাহাকে ধমকাইয় উঠিল, দূর হ, সামনে থেকে দূর হ!

সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয় রহিল।

বিন্দু আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া দুধ জ্বাল দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে বিন্দু দুধ লইয়া চলিয়া গেলে তিনি পাচিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শুন্‌লে মেয়ে, ওর কথা? সেই যে একদিন হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলুম, অমূল্যকে নে, সেই জোরে আজ আমাকেও দিব্যি দিয়ে গেল!

যাহা হৌক, এমনি করিয়া অন্নপূর্ণার ছেলে বিন্দুবাসিনীর কোলে মানুষ হইতে লাগিল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অমূল্য খুড়িকে 'মা' এবং মাকে 'দিদি' বলিতে শিখিল।

(২)

ইহার বছর চারেক পরে, যেদিন খুব ঘটা করিয়া অমূল্যর হাতে-খড়ি হইয়া গেল, তাহার পরদিন সকালে অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বাহির হইতে বিন্দুবাসিনী ডাকিয়া কহিল, দিদি অমূল্যধন প্রণাম করতে এসেছে, একবারটি বাইরে এসো।

অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া অমূল্যের সাজগোজ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তাহার চোখে কাজল, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, মাথার উপর চুল ঝুটি করিয়া বাঁধা, পরণে একটি হলদে্ রঙের ছাপান কাপড়, একহাতে দড়িবাঁধা মাটির দোয়াত, বগলে ক্ষুদ্র একখানি মাদুর জড়ানো গুটিকয়েক তালপাতা।

বিন্দু বলিল, দিদিকে প্রণাম করত বাবা।

অমূল্য জননীকে প্রণাম করিল।

তাহার পায়ে জুতা নাই, মোজা নাই, পরণে নানাবিধ বিলাতী পোষাক নাই—অন্নপূর্ণা এই অপরূপ সাজ দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, এতও তোর আসে ছোটবৌ। ছেলে বুঝি পড়তে যাচ্ছে ?

বিন্দু হাসিমুখে বলিল, হ্যাঁ, গঙ্গা পণ্ডিতের পাঠশালে পাঠিয়ে দিচ্চি ? আশীর্বাদ কর দিদি, আজকের দিন যেন ওর সার্থক হয়।

চাকরের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, ভৈরব, পণ্ডিত মশাইকে আমার নাম ক'রে বিশেষ ক'রে বলে দিস্ ছেলেকে আমার যেন কেউ মারধোর না করে। দিদি এই পাঁচটা টাকা ধর, বেশ ক'রে একখানি সিদে সাজিয়ে টাকা ক'টি দিয়ে কদমের হাতে পাঠশালায় পাঠিয়ে দাও। বলিয়া সে গভীর স্নেহে চুমা খাইয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

॥ জতুগৃহদাহ ॥

রাজশেখর বসু

পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য দুর্যোধন তাঁর মাতুল সুবলপুত্র শকুনি ও কর্ণের সঙ্গে মন্ত্রনা করতে লাগলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, পিতা, পুরবাসীগণ আপনাকে আর ভীষ্মকে অনাদর করে যুধিষ্ঠিরকেই রাজা করতে চায়। আপনি অন্ধ ব'লে রাজ্য পান নি, পাণ্ডু পেয়েছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুর পুত্ররাই যদি বংশানুক্রমে রাজ্য পায় তবে আমাদের বংশ অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে। আপনি কৌশল ক'রে পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসিত করুন, তা হ'লে আমাদের আর ভয় থাকবে না।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পাণ্ডু যেমন প্রজাদের প্রিয় ছিলেন যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ হয়েছেন, তাঁর সহায়ও আছে, তাঁকে আমরা কি ক'রে নির্বাসিত করতে পারি? ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ তা সমর্থন করবেন না। দুর্যোধন বললেন, আমি অর্থ আর সম্মান দিয়ে প্রজাদের বশ করেছি, অমাত্যগণ এবং ধনাগারও আমাদের হাতে। ভীষ্মের কোন পক্ষপাত নেই, অশ্বত্থামা আমাদের পাশে আছেন, দ্রোণও পুত্রের অনুকরণ করবেন, কৃপও তাঁর ভাগিনেয়কে ত্যাগ করবেন না। বিদুর আমাদের অর্থে পুষ্ট হয়েও গোপনে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি একলা আমাদের বাধা দিতে পারবেন না। আপনি আজই পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীকে বারণাবতে পাঠান।

ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ অনুসারে কয়েকজন মন্ত্রী পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বললেন, বারণাবত অতি মনোরম নগর, সেখানে পশুপতির উৎসব উপলক্ষ্যে এখন বহুলোকের সমাগম হয়েছে। এই প্রকার বর্ণনা শুনে পাণ্ডবদের সেখানে যাবার ইচ্ছা হ'ল। ধৃতরাষ্ট্র তাদের বললেন, বৎসগণ, আমি শুনেছি যে বারণাবত অতি রমণীয় নগর। তোমরা সেখানে উৎসব দেখে এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কদের ধনদান করে কিছুকাল আনন্দে কাটিয়ে এস। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়

এবং নিজের অসহায় অবস্থা বুঝে সম্মত হলেন এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির আশীর্বাদ নিয়ে মাতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

দুর্যোধন অতিশয় হৃষ্ট হলেন এবং পুরোচন নামক এক মন্ত্রীর হাত ধরে তাঁকে গোপনে বললেন, তুমি ভিন্ন আমার বিশ্বাসী সহায় কেউ নেই। তুমি দ্রুতগামী রথে আজই বারণাবতে যাও এবং শন, সর্জরস (ধুনা) প্রভৃতি দিয়ে একটি চতুঃশাল (চকমিলান) সুসজ্জিত গৃহ নির্মাণ করাও। মৃত্তিকার সঙ্গে প্রচুর ঘৃত, তৈল, বসা, জতু (গালা) মিলিয়ে তার দেওয়ালে লেপে দেবে এবং চতুর্দিকে কাষ্ঠ তৈল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ এমন করে রাখবে যাতে পাণ্ডবরা বুঝতে না পারে। তুমি সমাদর করে পাণ্ডবদের সেখানে বাসের জন্য নিয়ে যাবে এবং উত্তম আসন, শয্যা, যান প্রভৃতি দেবে। কিছুকাল পরে যখন তারা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রামগ্ন থাকবে তখন দ্বারদেশে অগ্নিদান করবে। পুরোচন তখনই দুর্যোধনের আদেশ পালন করতে বারণাবতে গেলেন।

বুদ্ধিমান বিদুর দুর্যোধনের ভাবভঙ্গী দেখে তাঁর দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির দুজনেই ম্লেচ্ছভাষা জানতেন। যুধিষ্ঠিরের যাত্রাকালে বিদুর অন্যের অবোধ্য ম্লেচ্ছভাষায় তাঁকে বললেন, শত্রুর অভিসন্ধি যে জানে সে যেন বিপদ থেকে নিস্তারের উপায় করে, লৌহ ভিন্ন অন্য অস্ত্রেও প্রাণনাশ হয়। অগ্নিতে শুষ্ক বন দগ্ধ হয়, কিন্তু গর্তবাসীর হানি হয় না। মানুষ শজারুর ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা দিক্‌-নির্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখে, সে নিজেকে এবং আরও পাঁচ জনকে বাঁচাতে পারে! যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন বুঝেছি।

পথে যেতে যেতে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, বিদুর তোমাকে অবোধ্য ভাষায় কি বললেন, আর তুমিও বুঝেছি বললে, এর অর্থ কি? যুধিষ্ঠির বললে, বিদুরের কথার অর্থ—আমাদের ঘরে আগুন লাগবে, পালাবার জন্য সকল পথই যেন আমরা চিনে রাখি।

পাণ্ডবগণ বারণাবতে এলে সেখানকার প্রজারা জয়ধ্বনি করে সম্বর্ধনা করলে, তাঁরাও ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অধিবাসীর গৃহে গিয়ে দেখা করলেন। পুরোচন মহা সমাদরে তাঁদের এক বাসভবনে নিয়ে গেলেন এবং আহার, শয্যা

প্রভৃতির ব্যবস্থা করলেন। সেখানে দশ রাত্রি বাসের পর তিনি পাণ্ডবদের অন্য এক ভবনে নিয়ে গেলেন, তার নাম 'শিব', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অশিব। যুধিষ্ঠির সেখানে গিয়ে ঘৃত, বসা ও লাক্ষার গন্ধ পেয়ে ভীমকে বললেন, নিপুণ শিল্পীরা এই গৃহ আগ্নেয় পদার্থ দিয়ে প্রস্তুত করেছে, পাপী পুরোচন আমাদের দগ্ধ করতে চায়। ভীম বললেন, যদি মনে করেন এখানে অগ্নিভয় আছে তবে পূর্বের বাসস্থানেই চলুন। যুধিষ্ঠির তাতে সম্মত হলেন না, বললেন, আমরা সন্দেহ করছি জানলে পুরোচন বলপ্রয়োগ করে আমাদের দগ্ধ করবে। যদি পালিয়ে যাই তবে দুর্যোধনের চরেরা আমাদের হত্যা করবে। আমরা মৃগয়ার ছলে এই দেশের সর্বত্র বিচরণ করে পথ জেনে রাখব এবং এই জতুগৃহের ভূমিতে গর্ত করে তার ভিতরে বাস করব, আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দও কেউ শুনতে পাবে না।

সেই সময়ে একটি লোক এসে নির্জনে পাণ্ডবদের বললে, আমি খননকার্যে নিপুণ, বিদুর আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের যাত্রার পূর্বে তিনি ম্লেচ্ছ-ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করেছিলেন তা আমি জানি, এই আমার বিশ্বস্ততার প্রমাণ। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে পুরোচন এই গৃহের দ্বারে আগুন দেবে। এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি বিদুরের তুল্যই। আমার হিতার্থী। অগ্নিদাহ থেকে আমাদের রক্ষা কর। দুর্যোধনের আদেশে পুরোচন এই ভবনে অনেক অস্ত্র এনে রেখেছে। এখান থেকে পলায়ন করা দুঃসাধ্য। তুমি গোপনে আমাদের রক্ষার উপায় কর। খনক পরিখা ও গৃহমধ্যে গর্ত করে এক বৃহৎ সুরঙ্গ প্রস্তুত করলে এবং তার প্রবেশের পথে কপাট লাগিয়ে ভূমির সমান করে দিলে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। পুরোচন গৃহের দ্বারদেশেই বাস করতেন, সেজন্য সুরঙ্গের মুখ আবৃত করা হল। পাণ্ডবরা দিবসে এই বন থেকে অন্য বনে মৃগয়া করতেন এবং রাত্রিকালে সশস্ত্র ও সতর্ক হয়ে সুরঙ্গের মধ্যে বাস করতেন।

এইরূপে এক বৎসর অতীত হলে পুরোচন স্থির করলেন যে, পাণ্ডবদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, এখন আমাদের পলায়নের সময় এসেছে, আমরা অন্ধকারে আগুন দিয়ে পুরোচনকে দগ্ধ করব

এবং অন্য ছ' জনকে এখানে রেখে চলে যাব। একদিন কুন্তী ব্রাহ্মণ-ভোজন করালেন, অনেক স্ত্রীলোকও এল, তারা যথেচ্ছ পানভোজন করে রাত্রিতে চলে গেল। এক নিষাদ-স্ত্রী তার পাঁচ পুত্রকে নিয়ে খেতে এসেছিল, সে পুত্রদের সঙ্গে প্রচুর মদ্যপান করে মৃতপ্রায় হয়ে গৃহমধ্যেই নিদ্রামগ্ন হল। সকলে সুষুপ্ত হলে ভীম পুরোচনের শয়নগৃহের, জতুগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে দিলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী সুরঙ্গে প্রবেশ করলেন। প্রবল বায়ুতে জতুগৃহের সর্বদিক জ্বলে উঠল, অগ্নির উত্তাপে ও শব্দে নগরবাসীরা জেগে উঠে বলতে লাগল, পাপিষ্ঠ পুরোচন দুর্যোধনের আদেশে এই গৃহদাহ করে পাণ্ডবদের বধ করেছে। দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, যিনি নির্দোষ পাণ্ডবগণকে শত্রুর ন্যায় হত্যা করিয়েছেন। ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা পুরোচনও পুড়ে মরেছে। বারণাবত-বাসীরা জ্বলন্ত জতুগৃহের চতুর্দিক থেকে এইরূপে বিলাপ করে রাত্রি যাপন করলে।

পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী অলক্ষিত হয়ে সুরঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। নিদ্রার ব্যাঘাতে এবং ভয়ে তাঁরা চলতে পারলেন না। মহাবল ভীমসেন কুন্তীকে কাঁধে এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে যুধিষ্ঠির-অর্জুনের হাত ধরে বেগে চললেন। বিদুরের একজন বিশ্বস্ত অনুচর গঙ্গার তীরে একটি বায়ুবেগসহযন্ত্রযুক্ত পতাকা-শোভিত নৌকা রেখেছিল। পাণ্ডবগণকে গঙ্গার অপর পারে এনে বিদুরের অনুচর জয়োচ্চারণ করে চলে গেল।

নৌকা থেকে নেমে পাণ্ডবরা নক্ষত্র দেখে পথ নির্ণয় করে দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলেন। দুর্গম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পরদিন সন্ধ্যাকালে তাঁরা হিংস্র প্রাণি-সমাকুল ঘোর অরণ্যে উপস্থিত হলেন। কুন্তী প্রভৃতি তৃষ্ণায় কাতর হওয়ায় ভীম পদ্মপুটে এবং উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলেন। সকলে ক্লান্ত হয়ে ভূমিতে নিদ্রামগ্ন হলেন, কেবল ভীম জেগে থেকে নানা প্রকার চিন্তা করতে লাগলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে বারণাবতবাসীরা আগুন নিভিয়ে দেখলে পুরোচন পুড়ে মরেছেন। পাণ্ডবদের খুঁজতে খুঁজতে তারা নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রের দগ্ধ দেহ পেয়ে স্থির করলে যে, কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব নিহত হয়েছেন। তারা সুরঙ্গ

দেখতে পেলেন না। কারণ খনক তা মাটি দিয়ে ভরিয়েছিল। হস্তিনাপুরে সংবাদ গেলে ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলাপ করলেন এবং কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদির অন্ত্যেষ্টির জন্য বারণাবতে লোক পাঠালেন। তারপর জ্ঞাতিগণের সঙ্গে ভীষ্ম ও সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র নিরাভরণ হয়ে একবস্ত্রে গঙ্গায় গিয়ে তর্পণ করলেন। সকলে রোদন করতে লাগলেন, কেবল বিদুর অধিক শোক প্রকাশ করলেন না।

।। রং ।।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সাদা আলোর বর্ণালিতে যে ভিন্ন ভিন্ন রং দেখা যায় সেগুলিকে বিশুদ্ধ রং বলা হয়। দুই বা তার বেশি বিশুদ্ধ রং মিশিয়ে নানা রঙের সৃষ্টি করা যায়। এই মিশ্রিত রং নতুন রকমের অনুভূতি দেয়। যে-সব রং দিয়ে এই মিশ্রিত রং তৈরি হল, মিশ্রণের মধ্যে চোখ পৃথক্‌ভাবে তাদের আর খুঁজে পায় না।

দেখা যায়, দুটি বিশেষ রকমের রং মিশে অনেকটা সাদা আলোর অনুভূতি জাগায়, যেমন---নারঙ্গ ও নীল, হলদে ও মহানীল। অবশ্য সূর্যের আলোর মতো সাদা হয় না।

প্রকৃতিতে যে ভিন্ন ভিন্ন রঙিন পদার্থ দেখা যায়, সে সব রঙের উৎপত্তি হয় অন্য রকমে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। লাল টক্‌টকে একটা জবাফুল দেখছি। ওই জবাফুলের একটা বিশেষ ধর্ম আছে। সে বেগনি, মহানীল, নীল, সবুজ, হলদে, নারঙ্গ ঐ-সব রং শুষে নেয়, ছেড়ে দেয় শুধু লাল। সূর্যের সাদা আলোর মধ্যে লাল ছাড়া আর সব রংকে শুষে নিল লালকে ছেড়ে দিল, ফুলটা লাল দেখাল। ওই যে কথাটা বলা হল, এই ভাবে তার যাচাই হতে পারে : অন্ধকার ঘরে দেওয়ালের উপর একটা চওড়া বর্ণালি ফেলা হল। এই বর্ণালির ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় ওই জবাফুলটি ধরলে দেখা যাবে যে, লালের মধ্যে রাখলে ওটা লাল, কিন্তু অন্য কোন রঙের মধ্যে আনলে ওটা একেবারে কাল দেখাচ্ছে। পরীক্ষাটা অন্যভাবেও করা যেতে পারে। একটা অন্ধকার ঘর কেবলমাত্র সোডিয়াম বাষ্পের হলদে রং দিয়ে আলোকিত করা হল। এখন এই ঘরে যদি লাল জবাফুল আনা যায়, তবে তাকে কাল দেখাবে। কারণ, এই ঘরে একমাত্র হলদে রং আছে, জবাফুল এই হলদে রং শুষে নিল, কোন রং ছাড়ল না, কাজে-কাজেই ওটা কাল দেখাল। আর শুধু লাল জবাফুল নয়,

ঘরের মধ্যে সবুজ নীল প্রভৃতি রঙের যে-কোন জিনিস আনা হোক, সব কাল দেখাবে। একমাত্র হলদে জিনিসই হলদে দেখাবে।

একখানা সাদা কাগজ বা যে-কোন সাদা জিনিস কোন রংই শুষে নেয় না, কাজে-কাজেই লাল রঙের মধ্যে ধরলে তাদের লাল দেখায়, নীল রঙের মধ্যে নীল, যে-কোন রঙের মধ্যে ধরা যাক সেই রঙেরই দেখাবে।

কাল বলে কোন রং নেই, রং মাত্রেরই অভাব হল কাল।

প্রতিফলিত আলোতে আমরা ভিন্ন-ভিন্ন জিনিস দেখি। অবশ্য যারা নিজেরা আলো দেয় তাদের কথা আলাদা। যখন প্রতিফলন হয় তখন পদার্থের কণাগুলি রং শুষে নেয়। শুধু উপরের কণারা নয় ভিতরের কণারাও এ-কাজে যোগ দেয়। সেইজন্য অনেক সময় দেখা যায়, রঙিন জিনিসকে গুঁড়া করলে তাদের সাদা দেখায়। এখানে আলো পদার্থের ভিতরে ঢুকছে না, শুধু উপরের কণাগুলি থেকে প্রতিফলন হচ্ছে, আর তারা শুষছে অতি কম। তুঁতে, লাল কাচ গুঁড়ো করলে সাদাই দেখায়।

এইবার দেখা যাক, দুরকমের দুটি রঙিন জিনিস মেশালে তাদের কি রকম দেখাবে। ধরা যাক, হলদে ও নীল রঙের গুঁড়ো মেশান হল। ওই মেশানো গুঁড়ো কি রকম দেখাবে?

এখানে হলদে গুঁড়ো হলদে রং ছেড়ে দেবে, আর কিছু পরিমাণে দু'পাশের নারঙ্গ ও সবুজ ছাড়বে, অন্য সব রং শুষে নেবে। আর নীল রঙের গুঁড়ো নীল ছাড়বে, আর অল্প পরিমাণে ছাড়বে ওর দুপাশের সবুজ ও মহানীল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দুটোর মধ্যে একটা যা ছাড়ছে অন্যটা তা শুষে নিচ্ছে, শুধু ব্যতিক্রম হচ্ছে সবুজের বেলায়, সবুজকে দুটোই ছেড়ে দিচ্ছে। কাজে-কাজেই মেশানো গুঁড়োকে সবুজ দেখাবে। অতএব দাঁড়াচ্ছে, নীল আলো ও হলদে আলো মেশান এক কথা, আর নীল রঙের ও হলদে রঙের গুঁড়ো মেশান আর এক কথা।

আর একটা ব্যাপার আছে। লাল, সবুজ ও নীল এই তিন রকমের রং উপযুক্ত পরিমাণে মেশালে মোটামুটি যে-কোন রং পাওয়া যায়। সেই কারণে এই তিনটি রংকে প্রাথমিক রং বলা হয়।

॥ সেকালের বাজার দর ॥

সুরেন্দ্রনাথ সেন

কয়েকবছর আগে পোকায় কাটা, ছেঁড়া, একতাড়া কাগজের মধ্যে আমার দাদামহাশয়ের পূজার হিসাবের খাতা পাইয়াছিলাম। তখন আমাদের ঘরে ছোট ছেলেমেয়ে বেশী না থাকিলেও বড়রা দলে বেশ ভারি ছিলেন। ছোট ছেলেদের জামাকাপড়ের চেয়ে—বড়দের ধুতি-জামা-জুতা দামে কিছু সস্তা নয়। কিন্তু তোমরা হয়ত বিশ্বাস করিবে না যে, সে-বছর দাদামহাশয় কাপড়ের দোকানে খরচ করিয়াছিলেন মাত্র ছাব্বিশ টাকা কয়েক আনা!

দাদামহাশয়ের সে-খাতায় ষাট বছর আগের বাজার দরের খবর পাওয়া যায়। কিন্তু বাদশাহী আমলে, অর্থাৎ তিন চারি শত বৎসর পূর্বে, বাঙ্গালাদেশে জিনিসপত্র জলের দরে বিকাইত। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে উত্তর আফ্রিকা হইতে ইবন্ বতুতা নামক একজন মুসলমান পণ্ডিত ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। দেশে-দেশে ঘুরিয়া বেড়ানো তাঁর একটা বাই ছিল। একপথে তিনি কখনও দুইবার যাইতেন না। মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পর্যন্ত অনেক দেশে বেড়াইয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাংলা দেশের মত সস্তার বাজার তিনি আর কোথাও দেখেন নাই।

১৫১৮ সালে, অর্থাৎ চারিশত চল্লিশ বৎসর আগে, দোম জোয়াঁয়ো লীমা নামক এক পর্তুগীজ ভদ্রলোক বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। কেবল নূতন দেশ দেখা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বাক্সবোঝাই টাকা নিতে তিনি আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের দেশের রাজার নিকট চিঠি লিখিয়া এখানকার বাজার দর জানাইয়াছিলেন। তখন নাকি বাঙ্গালার বাজারে টাকায় চারি মণ ভাল চাউল, ছয় পয়সায় কুড়িটা মুরগী ও তেইশটা হাঁস এবং তিন আনায় একটা দুধেল গাই পাওয়া যাইত! সেকালে

আবার গোলাম ও বান্দী কেনাবেচা চলিত। একটি গোলামের দাম ছিল আট আনা—আর বান্দীর দাম ছিল ঠিক উহার দ্বিগুণ।

দোম জোয়াঁয়ো লীমার অনেক পরে—১৬৫৬ সালে, একজন ফরাসী ডাক্তার ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসেন। তিনি প্রায় একযুগ বা বারো বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। এই ভদ্রলোকের নাম ফ্রান্সোয়া বর্ণিয়ে। তিনি নূতন-নূতন দেশ দেখিতে খুব ভালবাসিতেন; তাই একবার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন মুরগীর দাম প্রায় এগার গুণ চড়িয়া গিয়াছে। ১৫১৮ সালে ছয় পয়সায় কুড়িটা মুরগী পাওয়া যাইত, বর্ণিয়ে যখন বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন তখন কুড়িটা মুরগীর দাম এক টাকা। ছাগল-ভেড়ার দামও নাকি এই রকমই সস্তা ছিল। আর বাঙ্গালা দেশ হইতে চাউল, চিনি, সূতী ও রেশমী কাপড় যে দেশ-বিদেশে কত রপ্তানী হইত, তাহার হিসাব দেওয়াই শক্ত। তখন নাকি বিদেশী লোকেরা বাঙ্গালায় আসিয়া আর দেশে ফিরিবার নামও করিত না।

বাদশাহ শাহজাহান ও ঔরংজীবের আমলে জীন ব্যাপ্তিস্ত তাভার্ণিয়ে নামক একজন ফরাসী সওদাগর ভারতে আসেন। তিনি জহরতের ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার বিবরণে দেখা যায় যে, সে সময় বাঙ্গালাদেশে হীরার খনি ছিল। ১৬৬৫ সালে তিনি আগ্রা হইতে ঢাকা আসিবার পথে বাঙ্গালাদেশের খাজনার গাড়ী দেখিয়াছিলেন। ছয়-বলদে-টানা একশত দশখানা গাড়ীর প্রত্যেকখানিতে পঞ্চাশ হাজার করিয়া টাকা বোঝাই ছিল। তাভার্ণিয়ে বলেন, সেকালে সরকারী সমস্ত খরচ বাদে বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে প্রতিবৎসর পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা বাদশাহী খাজনাখানায় যাইত। তখনকার বাজার দর হিসাব করিলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নিতান্ত কম মনে করা যায় না। তাভার্ণিয়ে বড় মানুষদের সঙ্গে কারবার করিতেন। তিনি ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী প্রভৃতি বড় বড় সহরে ঘুরিয়াছিলেন কিন্তু তাহার অনেক পূর্বে র‍্যাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ নামক একজন ইংরাজ বণিক শ্রীপুর, বাকলা, সোনার গাঁও প্রভৃতি সহরের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বাকলা সহরের এখন আর চিহ্নও নাই, শ্রীপুর পদ্মার গর্ভে, সোনার গাঁও এখন সামান্য গ্রাম। অথচ তখন এইসব জায়গাই ছিল বাঙ্গালাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য-

কেন্দ্র। এইসব সহরের বাজারে লক্ষ-লক্ষ টাকার কাপড়, চিনি ও অন্যান্য জিনিসের বেচাকেনা হইত।

এখন আমাদের দেশের সে সম্পদের কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। হীরার খনি কবে শেষ হইয়াছে কে বলিবে? বাঙ্গালার সূতী ও রেশমী কাপড় বিদেশে চালান হওয়া দূরের কথা---এখন সস্তা বিদেশী কাপড়ে বাঙ্গালার বাজার ভরিয়া গিয়াছে। ছোট ছেলেমেয়েদের সস্তা খেলনা পর্যন্ত এখন জাপান হইতে আসে। বড় হইয়া তোমরা যদি আবার দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পার তবেই না তোমরা সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে।

॥ হিজল বিল ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মা-ভাগীরথীর কূলে-কূলে চরভূমিতে ঝাউবন আর ঘাসবন, তারই মধ্যে বড়-বড় দেবদারু গাছ। উলুঘাস, কাশশর আর সিদ্ধি গাছে-গাছে চাপ বেঁধে আছে। মানুষের মাথার চেয়েও উঁচু। এরই মধ্যে গঙ্গার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হিজল বিল এঁকেবেঁকে নানান ধরনের আকার নিয়ে চ'লে গেছে। ক্রোশের পর ক্রোশ লম্বা হিজল বিল। বর্ষার সময় হিজল বিল বিস্তীর্ণ, বিপুল, গভীর, শীতে জল ক'মে আসে, গঙ্গার টানে জল নেমে যায়, সূর্যের উত্তাপে শুকিয়ে আসে, তখন হিজল বিল টুকরো-টুকরো। হিজল বিল থেকে নালার শতনরী গিয়ে মিশেছে গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে; আশ্বিনের পর থেকে টুকরো-টুকরো বিলগুলিকে দেখে মনে হয়, ওই হারের সঙ্গে গাঁথা কালো মাণিকের ধুকধুকি। তখন হিজল বিলের জলের রঙ কাজল-কালো, নীল-আকাশ জলের বুকে স্থির হয়ে আসে, যেন ঘুমোয়। চারিপাশের ঘাসবনে তখন ফুল ফোটে। সাদা নরম পালকের ফুলের মত কাশফুল, শরফুল—অজস্র, রাশি রাশি। দূর থেকে মনে হয়, শরতের সাদা মেঘের পুঞ্জ বুঝি হিজল বিলের কূলে নেমে এসেছে—তার সেই ঘন কালো রঙ, বর্ষায় যা ধুয়ে-ধুয়ে, গ'লে-গ'লে, ঝ'রে প'ড়ে জমা হয়ে আছে ওই হিজল বিলের জলের বুকে—তাই ফিরিয়ে নিতে এসে বিলের কূলে প্রতীক্ষমান হয়ে বসে আছে। মধ্যে-মধ্যে হিজল বিলের বাতাস ভ'রে ওঠে অপরূপ সুগন্ধে। পাশেই গঙ্গার বুকে নৌকা চলে অহরহ,—সেই সব নৌকায় মাঝিমাল্লারা পুরুষানুক্রমে জানে, কোথা থেকে আসছে এ সুগন্ধ। তাদের মনে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন কথাও বলে না—গন্ধ নাকে ঢুকবামাত্র শুধু হিজল বিলের ঘাসবনের দিকে যেন অকারণেই বারেকের জন্য তাকিয়ে নেয়। আরোহী থাকলে তারাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—কোথা থেকে এ গন্ধ আসছে মাঝি? আঃ!

মাঝি আবার একবার তাকায় বিলের ঘাসবনের দিকে, বলে—ওই হিজল বিলের ঘাসবন থেক্যা বাবু। ঘাসবনের ভিতর কোথাকে বুনো লতায় কি বুনো ঝোপে ঝাড়ে ফুল ফুটি থাকবে।

হিজল বিলের ডাক শুধু গন্ধেরই নয়—শব্দেরও আছে।

হিজল বিলে ওঠে বিচিত্র কলকল শব্দ।

আরোহী যদি ঘুমিয়ে থাকে, তবে ওই শব্দে যায় ভেঙ্গে সে ঘুম। সে শব্দ যেমন উচ্চ তেমনি বিচিত্র। মধ্যে-মধ্যে উচ্চ শব্দকে উচ্চতম গ্রামে তুলে আকাশে ঠিক যেন ভেরীনাদ বেজে ওঠে—কর্ কর্ কর্ কর্ কর্ কর্! ভেরীর আওয়াজের মত শব্দ ছড়িয়ে পড়ে হিজলের আকাশের দিকে দিগন্তরে। আরোহী জেগে উঠে সবিস্ময়ে তাকায়—কি হ'ল? কোথায়, কে বাজায় ভেরী? সত্যিই কি আকাশে ভেরী বাজছে? কে বাজাচ্ছে? মাঝি আরোহীর বিস্ময় অনুমান ক'রে হেসে রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—পাখী বাবু—'গগন ভেরী' পাখী; হুই-হুই উড়ে চলছে। ওই দেখ বিপুল আকারের পাখী তার বিশাল পাখা মেলে ভেসে চলেছে আকাশে। ভেরীর আওয়াজের মত ডাক, নাম তাই গগনভেরী। গরুড়ের বংশধর ওরা। গরুড় আকাশ পথে চলেন লক্ষ্মী-নারায়ণকে পিঠে বয়ে নিয়ে। বংশধরেরা নাকি আগে চলে এই ভেরীনাদ কন্ঠে বাজিয়ে। মাঝিই বলবে আরোহীকে। ওরাই জানে এ দিব্য সংবাদ। নীচে অন্য পাখীরাও কলরব ক'রে ডেকে ওঠে। তারাও পুলকিত হয় দেবতার আবির্ভাবে।

বিলের বুকে হাঁসের মেলা বসেছে, কার্তিক মাস পড়তে না পড়তে। হাজারে হাজারে, ঝাঁকে ঝাঁকে, নানান আকারের বহু বিচিত্র বর্ণের হাঁস এসে বাসা নিয়েছে। জলের বুকে ভাসছে, ডুবছে, উঠছে, বিলের চারিপাশের শালুক-পানাড়ি-পদ্মবনের মধ্যে ঠুকরে ঠুকরে টাটি ভেঙে খাচ্ছে, ডুব দিয়ে শামুক-গুগলি তুলছে, কলরব করছে, মধ্যে-মধ্যে পাক দিয়ে উড়ছে, ঘুরছে, আবার ঝপঝপ ক'রে জলের বুকে ঝাঁপিয়ে ভেসে পড়ছে। বহু জাতের হাঁসের বিভিন্ন ডাক একসঙ্গে মেশানো এক কলরব—কল্-কল্, কল্-কল্, কাঁাক-কাঁা-ক, ক্যাও-ক্যাও-ক্যা-ও—ক্যা-ও। তার সঙ্গে ঐ ভেরীনাদের মত কর্-কর্ কর্-কর্ ধ্বনি।

নৌকার আরোহীরা সবিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকায়—এই বিচিত্র সঙ্গীত-ময় শব্দ শুনে দেখতে পায়, আকাশ ছেয়ে উড়ছে পাখীর ঝাঁক।

—এত পাখী!

—হিজল বিল বাবু। ওই তো ওই ঘাসবনের ঝাউবনের উপারে। ওই যে দেখছেন নালাগুলি, ওই সব নালা আসছে ওই বিল থেক্যা।

শিকারীরা প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। পুষ্পবিলাসী যারা তারাও ব্যগ্রতা প্রকাশ করে।

—শিকারে গেলে তো হয়!

—ওই ফুলের চারা পাওয়া যায় না মাঝি?

মাঝিরা শিউরে ওঠে। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে।—এমন কথাটি মুখে আনবেন না হুজুর। "যমরাজের দখিন দুয়ার হিজলেরই বিল।"

খুব সত্য কথা। এক বিন্দু অতিরঞ্জিত নয়। হিজলের ঘাসবনে, জলতলে মৃত্যুর বসতিই বটে।

রাত্রি হ'লে সে কথা বলে বুঝিয়ে দিতে হয় না। ঘাসবনের কোল ঘেঁষে স্রোত বেয়ে রাত্রে যখন নৌকা চলে তখন এ সত্য আপনি উপলব্ধি করে আরোহীরা। জ্যোৎস্না রাত্রি হয়তো; হিজল বিলের উপরে আকাশে চাঁদ, নীচে জলের অতলে চাঁদ। সাদা ফুলে ভরা কাশবন, শরবন জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে; ঝাউগাছের মাথা, দেবদারুর পাতা ঝিক্-ঝিক্ করছে; বাতাসের সর্বাঙ্গে ফুলের গন্ধের সমারোহ; আকাশে প্রতিধ্বনি উঠেছে, রাত্রিচর হাঁসের ঝাঁকের কল-কন্ঠের ডাকের বিচিত্র বিশাল একতান সঙ্গীতের মত, এমন সময় সমস্ত কিছুকে চকিত ক'রে দিয়ে একটা ডাক উঠল—ফে-উ। মুহূর্তে শিউরে উঠল সর্বাঙ্গ।

কয়েক মিনিট বিরতির পর আবার উঠল ডাক—ফেউ-ফেউ। আবার—ফেউ-ফেউ-ফেউ।

এবার স্তব্ধ ঘাসবনের খানিকটা ঠাঁই সশব্দে ন'ড়ে উঠল। জলে কুমীর পাক খেলে লেজের ঝাপটা মারলে যেমন আলোড়ন ওঠে, জল যেমন উথালপাথাল

ক'রে ওঠে—হিজলের ঘাসবনে তেমনি একটা আলোড়ন ওঠে---সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায়—নিম্ন ক্রুদ্ধ গর্জন—গর্‌র্! গ-র্-র্! ফ্যাস-ফ্যাস! গ-র্-র্! গোঁ! ওঁ!

চতুর, কুটিল চিতাবাঘের বাসভূমি—এই ঘাসবন, সিদ্ধির জঙ্গল. ঝাউ এবং দেবদারুর তলদেশগুলি। রাত্রে তারা বের হয়, পিছনে বের হয় ফেউ। ফেউয়ের ডাকে দাঁড়িয়ে উত্যক্ত চিতা লেজ আছড়ে নিম্ন ক্রুদ্ধ গর্জন করে, শাসায় ---গর্-র্ গ-র্-র্! কখনও কখনও এক-একটা উঁচু হাঁকও দিয়ে উঠে--- আঁ-ক! আঁ-ও! সঙ্গে-সঙ্গে দেয় একটা লাফ! চকিতে জ্যোৎস্নায় দেখা যায় চিত্রিত হলুদ পিঠখানা।

বিলের জলের ধারে কালো কিছু চঞ্চল হয়ে মুখ তুলে কান খাড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। গজরায়---গোঁ-গোঁ-গোঁ। কখনও-কখনও অবরুদ্ধ ক্রোধে অধীর হয়ে ছুটে যায় শব্দের দিক লক্ষ্য করে, কখনও-বা ছুটেও পালায়। বুনো শুয়োরের দল, বিলের ধারে মাটি খুঁড়ে জলজ উদ্ভিদের কন্দ খেতে-খেতে বাঘের সাড়ায় তারাও চঞ্চল হয়ে উঠে।

ভয় কিন্তু ওসবে নয়। চিতাবাঘ, বুনো শুয়োর বল্লমের খোঁচায় লাঠির ঘায়ে মারা যায়। এ দেশের গোয়ালারা, চাষীরা, জোয়ানেরা দল বেঁধে অত্যাচারী চিতাবাঘ, বুনো শুয়োর খুঁজে বার করে মেরে ফেলে। কিন্তু বাঘ-শুয়োরের চেয়ে ভয়ের আরও কিছু আছে। বাঘ, শুয়োর---এরাও তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত। ঘাসের বনের মধ্যে একফালি সরু পথের উপর দিয়ে যখন ওরা চলে, তখন চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে অতর্কিতে সাক্ষাৎ মৃত্যুর আক্রমণের আশঙ্কা। সামান্য শব্দে চকিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়, কান পেতে শোনে, মৃদু গর্জন করে। কোথা থেকে---হয়তো কোন ঝাউগাছের ডাল থেকে বা দেবদারুর ঘনপল্লবের মধ্য থেকে অথবা ঘন ঘাসবনের মাথার উপর বিস্তৃত লতার জাল থেকে একটা মোটা লম্বা দড়ি চাবুকের মত শিস দিয়ে আছড়ে এসে পড়বে তার গায়ে---চোখের সামনে লক্-লক্ করে দুলে উঠবে চেরা একখানা সরু লম্বা জিভ, মুহূর্তে বিঁধে যাবে একটা অগ্ন্যুত্তপ্ত সূক্ষ্ম সূচের মত কিছু; সঙ্গে-সঙ্গে মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শরীরের শিরায়, স্নায়ুতে বয়ে যাবে বিদ্যুতের প্রবাহের মত অনুভূতি, পৃথিবী

দুলে উঠবে, ঝিম-ঝিম করে উঠবে সর্বাঙ্গ। তারপর আর ভাবতে পারে না, দুরন্ত ভয়ে পিছিয়ে যায় কয়েক পা।

হিজল বিলে মা-মনসার আটন। পদ্মাবতী হিজল বনের পদ্ম-শালুকের বনে বাসা বেঁধে আছেন। চাঁদ বেনের সাত ডিঙা মধুকর সমুদ্রের বুকে ঝড়ে ডুবিয়ে এইখানে এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। বৃন্দাবনের কালীদহের কালীনাগ কালো ঠাকুরের দণ্ড মাথায় করে কালীদহ ছেড়ে এসে এখানেই বাসা বেঁধেছে। কালী-নাগ বলেছিল—তুমি তো আমাকে দণ্ড দিয়ে এখান থেকে নির্বাসন দিলে ; কিন্তু আমি যাব কোথায় বল? ঠাকুর বলেছিলেন—ভাগীরথীর তীরে হিজল বিল, যেখানে মানুষের বাস নাই, সেখানে যাও। বিশ্বাস না হয়, বর্ষার সময় গঙ্গার বন্যায় যখন হিজল বিল আর গঙ্গা এক হয়ে যায়, তখন গঙ্গার বুকের উপর নৌকা চড়ে হিজলের চারিপাশে একবার ঘুরে এসো। দেখবে জল—জল আর জল; উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে জল ছাড়া মাটি দেখা যায় না, জলের উপর জেগে থাকে ঝাউ আর দেবদারুর মাথাগুলি। দেখো, আকাশে পাখী উড়ে চলেছে—চলেছে তো চলেইছে। পাখা ভেঙ্গে আসছে, তবু সে গাছগুলির মাথার উপর বসছে না, কখনও কখনও খুব ক্লান্ত পাখী গাছের চারিদিকে পাক দিয়ে ঘুরে হতাশকন্ঠে যেন মরণ-কান্না কেঁদে আবার উড়ে যেতে চেষ্টা করে। কেন জান? গাছের মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। শরীর তোমার শিউরে উঠবে।

॥ চড়ুই পাখীরা কোথায় যায় ? ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বলতে পারো, চড়ুই পাখীরা কোথায় যায় ?

তারা তো মরে না। ছোটবেলা দু-একটা বাচ্চা কখনো-কখনো বাসা থেকে গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বড় চড়ুই পাখীকে মরতে দেখেছ কেউ কি ?

মানুষকে তারা ভালোবাসে। একদিন সব পাখীই হয়ত বাসত। কিন্তু আমাদের চালচলন, স্বভাব-চরিত্র দেখে হতাশ হয়ে সবাই আমাদের ছেড়ে গেছে। শুধু চড়ুই পাখীরা আজও আছে আমাদের সঙ্গে। আমাদের উঠোন, দালান, ঘর-দোরে তারা সারাদিন খেলা করে, আমাদের ছাদের কড়িকাঠের ফোকরে বাসা বেঁধে রাতে তারা ঘুমোয়। তাদের ভাষা আমরা বুঝি না, নইলে সারাদিন তারা কিচির-মিচির করে আমাদের কথাই যে বেশির ভাগ বলে, আমরা জানতে পারতাম।

চড়ুই পাখীরা সবাইকেই ভালোবাসে, কিন্তু এক-একটি চড়ুই-এর এক-একটি বিশেষ আদরের ছেলেমেয়ে থাকে। সে তার একেবারে আপনার। তাকে নিয়েই তার জীবন।

দুটো চড়ুই যখন ঝটাপটি করে ঝগড়া করছে মনে হয়, তখন হয়ত তোমাদের কথা নিয়েই তর্ক বেধেছে।

কালো ঠোঁটওয়ালা ঐ ডাগর পাখীটা হয়ত ঘাড়ের রোঁয়া-ফোলানো অন্য চড়ুইকে বলছে, তোমার কুটুস বড় হিংসুক, অতগুলো লজেঞ্চুস কিনে এনে দিদিকে একটা দিতে চায় না।

এই না শুনেই ও-চড়ুইয়ের ঘাড়ের রোঁয়া উঠেছে ফুলে, আমার কুটুস হিংসুক ! সেদিন রাস্তা থেকে আইসক্রীম কিনে কে ছুটতে ছুটতে এসেছিল দিদিকে ভাগ দেবার জন্য ?

কিন্তু আজ ? আজ বুঝি দিদিকে একটা লজেঞ্চুস দেওয়া যায় না ?

যাবে না কেন? কিন্তু কুট্টুসের বুঝি রাগ হতে নেই! সকালবেলা দিদি ওকে অমন বকুনি খাওয়ালো কেন? বাবার চশমাটা চোখে দিয়ে না হয় একটু বড় হতেই চেয়েছিল। ভেঙ্গে তো আর ফেলেনি!

কুট্টুস আর দিদির ভাব হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাদেরও ঝগড়া অবশ্য মিটে যায়। কিচির-মিচির করতে করতে তারা কলতলায় উড়ে যায় চাল-ধোওয়ার তদারক করতে।

যে-সব চালগুলো ধুতে গিয়ে পড়ে যায়, সেগুলো তো আর নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

যতদিন পারে চড়ুইরা এমনি করে মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কিন্তু এখানকার মেয়াদ তাদেরও একদিন ফুরোয়। তখন তারা কোথায় যায়? কেউ তা জানে না।

আমাদের কুট্টুস সক্কলকে জিজ্ঞাসা করেছে। কেউ ঠিক করে কিছু বলতে পারে না।

ঠাকুরমা হেসে বলেছেন, জানি না বাপু, এমন অনাছিষ্টি কথাও কখনো শুনিনি। নিজে এখন কোথায় যাব তারই ঠিক নেই, চড়ুই পাখীরা কোন্ চুলোয় যায় তার ঠিকানা বার করতে হবে!

মা বলেছেন, কোথায় যাবে আবার? স্বর্গে যায়।

কিন্তু কোথায় সেই চড়ুই পাখীদের স্বর্গ....কেমন করে তারা সেখানে যায়?

দিদি বলেছে, জানিস না? রাত হলে ওরা সব জোনাকি হয়ে উড়ে চলে যায়।

কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু জোনাকি হয়ে যেতে কেউ তো ওদের দেখেনি।

মাষ্টারমশাই বলেছেন, এসব বাজে কথা। কোথায় আবার যাবে! রাস্তায় ঘাটে মড়ে পড়ে থাকে, কাক-চিলে নিয়ে যায়।

কথাটা কুট্টুসের মোটেই পছন্দ হয়নি। রাস্তায় ঘাটে মরা চড়ুই সে তো কখনো দেখিনি।

বাবা বলেছেন হেসে, চড়ুই পাখীরা কেথায় যায়? নিজেই একদিন দেখো না, তাহলেই জানতে পারবে।

কুট্টুস তাই নিজেই দেখবে ঠিক করেছে।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সেদিন এসে পড়বে কে জানত! সেদিন রাত্রে সেই রোঁয়া-ফোলানো চড়ুইটা কিছুতেই আর বাসায় যেতে চায় না। কুট্টুস জানে, সন্ধে হতে-না হতেই রান্নাঘরের চালের ওপর শেষ মজলিস সাঙ্গ করে তারা যে যার বাসায় গিয়ে ঢোকে। আজ কিন্তু পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে শুতে যাচ্ছে, এমন সময় শুনল মা বলছেন, দেখেছো পাখীটার কাণ্ড! হতভাগা বাসায় না গিয়ে মরতে এখানে বসে আছে কেন?

সত্যিই সেই রোঁয়া-ফোলানো চড়ুইটা তার ঘরের ইলেকট্রিক ফ্যানের একটা পাখার ওপর ডানা গুটিয়ে কুঁকড়ে সুঁকড়ে বসে আছে চুপ করে।

কুট্টুসের মশারি ফেলে দেবার জন্যে মা ঘরে এসে আলোটা জ্বালতেই পাখীটা একবার চমকে উঠে ফর্‌ফর্‌ করে এদিক-ওদিক খানিক উড়ে বেড়ালো। তারপর আবার বসল সেই পাখার ওপর।

মা বললেন, আচ্ছা মুসকিল তো রে বাপু! এখুনি পাখা চালালে হতভাগা তো এদিকে-সেদিকে যেখানে হোক বসে শেষ পর্যন্ত বেড়ালের পেটে যাবে।

কুট্টুস তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আজ আর পাখা চালিও না মা, আমার একটুও গরম লাগছে না।

মা হেসে বললেন, দূর, সে কি হয়। তারপর পাখীটাকে বাসায় পাঠাবার কত চেষ্টাই তিনি করলেন। কিন্তু সে ঘুরে-ফিরে সেই পাখায় এসে বসবেই। কিছুতেই বাসায় যাবে না।

কুট্টুস হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন আজ বাসায় যাচ্ছে না মা?

কেন আর! মরণ ঘনিয়ে এসেছে বোধ হয়। বলে পাখীটার ওপর রাগ করেই মশারি ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

কুট্টুসের কিন্তু ঘুম আর আসে না। সত্যিই কি পাখীটার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। আজ তাহলে সে, সব চড়ুই পাখীরা যেখানে যায় সেইখানে যাবে? না, কিছুতেই আজ ঘুমোনো হবে না। আজ তাকে দেখতেই হবে, চড়ুই পাখীরা কোথায় যায়।

একটু একটু করে অনেক রাত হল। দূরের রাস্তায় ট্রামের শব্দ অনেকক্ষণ

গেছে থেমে। কোথায় একটা ঝিঁঝিপোকা ডাকছে---ডাক নয়, সে যেন ঘুম-পাড়ানি সুর। আকাশ থেকে ঝিম-ঝিম করে ঘুম নেমে আসছে।

কিন্তু কুট্টুস কিছুতেই ঘুমোবে না---কিছুতেই না। বিছানায় সে উঠে বসল। বাঃ, ঘরটায় আর অন্ধকার নেই। এরই মধ্যে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে কে!

সে উঠে বসতেই চড়ুই পাখীটা পাখার ওপর থেকে বলে উঠল, কী কুট্টুস।

আশ্চর্য! চড়ুই-এর কথা সে বুঝতে পারছে নাকি! চড়ুই সত্যিই তার নাম ধরে ডেকেছে। অবাক হয়ে তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে আর কোন সন্দেহ রইল না চড়ুই বললে, আজ আমি চললাম ভাই। ভালোই হল, যাবার সময় তোমার সঙ্গে কথা বলে গেলাম। কতদিন তোমার কাছে-কাছে থেকে কত কথা বলেছি, তুমি তো বুঝতে পারোনি।

তুমি আজ সত্যিই যাবে? কুট্টুসের চোখ তখন ছলছল করছে।

চড়ুই বললে, যেতেই হবে যে ভাই। যতদিন তুমি খুব ছোট ছিলে, ততদিন তোমার জন্যেই এখানে ছিলাম। এবার আমার এখানকার মেয়াদ ফুরিয়েছে।

কোথায় তুমি যাবে, আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে। নিয়ে যাবে আমায়?

যাবে তুমি? কিন্তু সে যে অনেক দূর!

তা হোক, আমায় নিয়ে যেতেই হবে।

বেশ, তাহলে তৈরী হয়ে থাকো। আর বেশি দেরি নেই।

দেরি নেই শুনে কুট্টুসের বুকটা উৎসাহে উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। কিন্তু তৈরী হয়ে থাকবে কী করে সে তো জানে না। সে ভাবনা অবশ্য আর বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। দেখতে দেখতে হাল্কা একটা সাদা মেঘ জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর নেমে এল। চারিদিক আবছা হয়ে গেল কুয়াশার পর্দায়। তারপর কুট্টুস টের পেল, ঘর-দোর, বাড়ী-শহর সব কোথায় হারিয়ে গেছে। সাদা মেঘের আঁচলে জড়িয়ে চড়ুয়ের সঙ্গে সে শূন্য আকাশে ভেসে চলেছে।

অনেক নিচে চেয়ে দেখলে হয়ত রাতের পৃথিবী এখনো দেখা যায়। শহরের আলোগুলো জোনাকির মৌচাকের মত এক জায়গায় জমে আছে। সে আলোও ক্রমশ হারিয়ে গেল। শুধু অসীম শূন্য! রঙবেরঙের মেঘ এদিকে-ওদিকে তাদেরই পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

খানিক বাদেই বোঝা গেল যে, সেগুলো নেহাৎ শুধু মেঘ নয়। হঠাৎ একটা করুণ কান্না শুনে কুটুস চমকে উঠে দেখে, একটা ছোট্ট জলভরা কালো মেঘ তাদের পাশ দিয়েই ভেসে যাচ্ছে। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, একি, কাঁদছে কে?

চড়ুই বললে, কাঁদছে বোধ হয় পৃথিবীর কোন ছেলেমেয়ে। ওরকম কান্না এখানে অনেক শুনবে। পৃথিবীর সমস্ত কান্না-হাসি এখানে ভেসে আসে— এটা কান্না-হাসির আকাশ কিনা!

চড়ুইয়ের কথা শেষ না হতেই মেঘটি নিজের থেকে বলে উঠল, হ্যাঁ, আমি এক ছোট মেয়ের কান্না। তার মা বাবা কেউ নেই। যাদের বাড়িতে থাকে তারা অনেক কষ্ট দেয়। রাতদিন খাটায়। আজ কাঁচের একটা গেলাস ধুতে গিয়ে সে ভেঙ্গে ফেলেছে। তাই মার খাবার ভয়ে সে কাঁদছে।

কুটুসের আরো শোনবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সাদা মেঘ সে কান্নাকে পেছনে ফেলে হু-হু করে এগিয়ে গেল। চড়ুই পাখি বললে, শুধু কান্না নয়, এখানে হাসিও মাঝে-মাঝে ভেসে আসে।

বলতে-বলতে একটা রাঙা সোনালি মেঘ তাদের পাশ দিয়ে আনন্দে ঝলমল করতে করতে উড়ে গেল। সারা গা দিয়ে তার হাসি যেন ঠিকরে পড়ছে। কুটুস শুনতে পেল, সে বলছে, পেয়েছি! পেয়েছি!

কী পেয়ে ওর এত খুশি? কুটুস অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

চড়ুই বললে, এমন কিচ্ছু নয়। অনেক কষ্টে ফুটবল ম্যাচ দেখবার একটা টিকিট পেয়েছে কিনা। তাই ছেলেটির এত আনন্দ।

আকাশে এবার যেন ঝড় বইতে শুরু করেছে। হু-হু করে তাদের সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। হঠাৎ কড়-কড়-কড়াৎ আগুনের হলকায় চোখ-মুখ তাদের যেন ঝলসে গেল। তারপর সে কী দুর্যোগ! চারিদিক থেকে আকাশ গর্জন করছে, আগুনের সাপের মত লকলকে জিভ বার করে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে।

চড়ুইকে জড়িয়ে ধরে কুটুস ভয়ে-ভয়ে বললে, এ আমরা কোথায় এলাম?

চড়ুই বললে, পৃথিবীর মানুষের মনে যেখানে যত বিষ আছে এখানে তাই বজ্র-বিদ্যুৎ হয়ে ফুটে ওঠে। মানুষের যত অন্যায়, অত্যাচার বা হিংসা, লোভ,

যত শয়তানি, স্বার্থপরতা—সব মিলে এইখানে এই ঝড় তুলেছে। মানুষের মনের বিষ না কাটলে এ ঝড় আর থামবে না।

অনেকক্ষণ বাদে সেই তুফানের রাজ্যও তারা পেছনে ফেলে এল। ক্রমশ যেন বড় ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। কুট্টুসের বেশ শীত করছে। দেখতে-দেখতে তাদের মেঘও সেই ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে তুষার হয়ে ধীরে-ধীরে তাদের নিয়ে নীচে ঝরে পড়ল।

এ কী আশ্চর্য দেশ! যতদূর দেখা যায় শুধু সাদা তুষারে ঢাকা। ঠাণ্ডায় হড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

শীতে কাঁপতে-কাঁপতে যতখানি সম্ভব চড়ুইয়ের গা ঘেঁসে দাড়িয়ে কুট্টুস ভয়ে ভয়ে বললে, এইখানেই তোমাকে থাকতে হবে নাকি ?

চড়ুই বললে, হ্যাঁ, পৃথিবী ছেড়ে এসে এইখানেই আমরা থাকি।

কিন্তু এখানে যে তোমার বড় কষ্ট হবে। চারিদিকে শুধু যে বরফ!

চারিদিকে শুধু বরফ বটে, কিন্তু তোমার কাছে ভরসা পেলে এখানে থাকতে আমার কষ্ট নাও হতে পারে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে চড়ুই আবার বললে, ভালো করে চেয়ে দেখ, এ তুষারের দেশ বটে, কিন্তু সব জায়গাই বরফে ঢাকা নয়।

সত্যিই চড়ুইয়ের কথা মিথ্যে নয়। চারিধারের তুষারের মাঝে এক-একটা জায়গা কোন্ যাদুমন্ত্রে যেন সবুজ হয়ে আছে। কোন্ অদৃশ্য উত্তাপ যেন সেখান থেকে সমস্ত তুষার গলিয়ে সরিয়ে দিয়েছে।

চড়ুই বললে, পৃথিবীর যেখানে যে যতখানি ভালো কাজ করে, তার হৃদয়ের উত্তাপ এমনি করে এখানকার বরফ ততখানি গলিয়ে দেয়। শুধু নিজের কথা না ভেবে সবাইকার জন্য যারা কাজ করে যায়, তাদের বুকের উত্তাপ এইখানে এসে জমা হয়। আর সেই উত্তাপ পেলে আমাদের কোন কষ্ট কখনো থাকে না।

তাদের চোখের সামনেই কাছাকাছি একটা জায়গায় তুষার গলে গিয়ে উজ্জ্বল সবুজ খানিকটা ঘাসে-ঢাকা জমি ফুটে উঠল। দেখা গেল, একটি চড়ুই সেখানে পাখনা ঝাড়ছে।

তুমি কোথা থেকে আসছ গো? কুট্টুস এগিয়ে গিয়ে না জিজ্ঞেস করে পারলো না।

পাখনা ঝাড়া শেষ করে নতুন চড়ুই পাখিটি বললে, আমি আসছি চীন থেকে। তান্‌ফু বলে একটি ছোট ছেলের মন আছে আমার জিম্মায়। বড় তারা গরিব। যুদ্ধের সময় তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, গ্রাম একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে। তাদের গাঁয়ের পাশে একটা পাগলা প্রকাণ্ড নদী আছে। ফি-বছর তাদের ঘর-বাড়ি, খেত-খামার সব বানে ভাসিয়ে দেয়। তান্‌ফু ঠিক করেছে, বড় হয়ে সেই নদীতে সে একটা বাঁধ দেবে, আর পোল বানাবে একটা, এপার থেকে ওপারে। ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্য তাই কাউকে কিছু না বলে সে একলা শহরে পালিয়ে যাচ্ছে। তার মনের উত্তাপেই এখানকার বরফ এমন গলে গেছে।

চীন দেশের চড়ুইয়ের কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল, কুট্টুস আর তার নিজের চড়ুইয়ের চারিধারে অনেক খানি বরফ গলে সরে গিয়েছে। কুট্টুসের চড়ুই পাখি ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ডানাদুটো দুবার ঝেড়ে বললে জানতাম, আমি আগেই জানতাম! কুট্টুস থাকতে কোনদিন আমায় শীতে কষ্ট পেতে হবে না। মনে-মনে আজ যে প্রতিজ্ঞা করেছ, কোনদিন যেন তা না ভাঙে।

কুট্টুসের গলা তখন ধরে এসেছে, প্রায় চুপি চুপি সে বললে, না, কোনদিন ভাঙবে না।

রোঁয়া-ফোলানো চড়ুই বললে, পৃথিবীর সব ছেলেমেয়ের মন যেদিন তোমার মত হবে, সেইদিন এদেশের কোথাও কোন তুষার আর থাকবে না; সাজানো বাগানের মত ফুলে-ফলে সব জায়গা ভরে যাবে।

চড়ুইয়ের কথা শেষ হতে-না-হতে কুট্টুসের মনে হল, চারিদিকের তুষার যেন ধোঁয়া হয়ে সব উড়ে যাচ্ছে। আবার চারিদিক ঝাপসা, ঝড়ের মত হাওয়া বইছে, আর কুট্টুস তাইতে ভেসে চলেছে।

হঠাৎ কুট্টুস শুনতে পেল মা তাকে ডাকছেন। চোখ রগড়ে সে বিছানায় উঠে বসল, তারপর ক্রমেই তার চোখ গেল সেই পাখির ওপর। চড়ুই পাখিটা সেখানে নেই। মা যেন তার মনের কথা টের পেয়ে বললেন, চড়ুই পাখিটা খুঁজছিস! সে কি আর আছে? গেছে কোথায় কোন বেড়ালের পেটে!

কুট্টুস কোন উত্তর দিলে না। চড়ুই পাখিরা কোথায় যায় সে জানে।

॥ পেয়ারা গাছের নীচে ॥

লীলা মজুমদার

বুড়ো দাদু আর মনুয়া দিনভর পেয়ারা গাছতলায় বসে থাকে। শীত এসে যায়, পেয়ারা গাছের পাতা বড়ো কম, ডালের মাঝখান দিয়ে রোদ এসে ওদের গায়ে পড়ে, ডালপালার আঁকাবাঁকা ছায়া ওদের গায়ে পড়ে। সেই ছায়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ওপর দিকে চেয়ে মনুয়া দেখে, আকাশের নীল গায়েও ঐ রকম ডালপালা সাদা রং দিয়ে আঁকা।

মনুয়া একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে, বুড়ো দাদু, কাল আমার জন্মদিন, আমার বন্ধু কাঁকরের তাই নেমন্তন্ন।

বুড়ো দাদু, নীল আকাশ যেখানে নীল বনের পেছনে ডুবে গেছে, সেদিকে চেয়ে বলেন, কাল আমারও জন্মদিন, আমার বন্ধুদেরও নেমন্তন্ন করতে হবে।

মনুয়া বলে, কারা তোমার বন্ধু, বুড়ো দাদু? তাদের চিঠি দিতে হবে না? মা কাল কিসমিস দিয়ে পায়েস রাঁধবে।

বুড়ো দাদু আরামকেদারার তলা থেকে ছোট্ট টিনের হাতবাক্স বের করে কাগজপত্র ঘেঁটে বলেন, কি জানি, তাদের নাম তো মনে পড়ছে না। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি যে কোপাই নদীতে চান করতে যেতাম, তাদের না বললে যে তারা মনে দুঃখ পাবে।

মনুয়া উঠে এসে বলে, দাও তো দেখি তোমার হাতবাক্স, আমি খুঁজে দেখি তাদের নাম ঠিকানা পাই কিনা।

কিন্তু বুড়ো দাদু কিছুতেই বাক্স দেবেন না। বলেন, নারে মনুয়া, তোমার বাবাকে, কাকে যেন একবার দিয়েছিলাম, সে ঘেঁটেঘুঁটে, তছনছ করে দিয়েছিল। পরে রসিদ খুঁজে পাওয়া যায় নি। তুই বরং অন্য কোথাও খুঁজে দেখিস।

তা হলে মাকে ক'জনার জন্য পায়েস রাঁধতে বলবো, বুড়ো দাদু?

বল্ গে এই পাঁচজনার জন্য।—নারে, দাঁড়া, দাঁড়া, যে আমার নতুন চটি কোপাইয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল তাকে বলে কাজ নেই। তার নষ্টামির

আর শেষ নেই। কি জানি তোদের এসব ফুলগাছটাছ যদি ছিঁড়ে মাড়িয়ে একাকার করে। ওকে বাদ দিলেই ভালো।

বেশ, তা হলে বলি চারজন?

নারে দাঁড়া, দাঁড়া। ঐ যার কটা চোখ, সে ভারি ঝগড়ুটি রে মনুয়া। শেষটা যদি তোর বন্ধু কাঁকরের সঙ্গে মারপিট করে? ওকেও না বলাই ভালো।

তবে কি তিন জনকে বলা হবে, বুড়ো দাদু?

বুড়ো দাদু অবাক হয়ে বলেন, তিনজন আবার কোথায় পেলি, মনুয়া? গয়লাবাড়ির ওপারে যে থাকে, গয়লাদের কাছ থেকে চুরি করে সর-মাখন খেয়ে খেয়ে, তার যে শরীরের আর কিছুই নেই। অতো পায়েস তার সইবে কেন? ওর নামটাও কেটে দে।

মনুয়া বললো, তা হলে আমার বন্ধু কাঁকর আর কাঁকরের ছোটো ভাই উদো আসবে। আর তোমার বন্ধু দু'জন তো.? যাই মাকে বলে আসি গে।

বুড়ো দাদু তাই শুনে মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কী জ্বালা! অতো তাড়াটা তোর কিসের শুনি? ঐ দু'জনের একজনের মুখে সারাক্ষণ মন্দ কথা লেগেই আছে, সে সব শুনে যদি তোরা শিখে ফেলিস? থাক, ওকে না বলাই ভালো।

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে ঘেঁষে বলে, তবে কি মোটে একজনকে বলবো?

বুড়ো দাদু, এদিকে ওদিকে বাগানের চারিদিকে, দূরে পাকড়াশীদের বাঁশ ঝাঁড়ের দিকে, আমতলির পথের দিকে চেয়ে বললেন, আবার একজন কোথায় পেলি রে মনুয়া? আমাকে সুদ্ধু নিয়ে বলেছিলাম পাঁচজন।

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে, তবে কি তোমার বন্ধুরা কেউ আসবে না?

বুড়ো দাদু শুনে অবাক হন।

কেউ আসবে না কি রে? ওরা ক'জনাই শুধু আসবে না, আর তো সবাই থাকবে। কাঁকর, কাঁকরের ভাই উদো, তুই, তোর মা-বাবা, কাকা, পিসি, তাদের বাবা, ভুলো। ভুলোকে ভুলিস নে যেন, নেড়ি কুত্তো হলে কি হবে, কী গায়ের জোর ভুলোর। ও হয়তো একটু বেশীই খাবে। কিন্তু---

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ে হাত বুলিয়ে বলে, কিন্তু কি বুড়ো দাদু?

আমি তোকে কি দেবো ? দে তো দেখি আমার হাতবাক্সটা।

বল কি চাস ? গয়না চাস ?

গয়না তুমি কোথায় পাবে বুড়ো দাদু।

কেন ? আমার ঠাকুরমার কতো গয়না ছিলো। ডাকাতদের সর্দার ছিলো আমার ঠাকুরমার বাবা। তার ভয়ে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। সন্ধের পর ভয়ে কেউ পথে বেরোত না। বেরোলেই তাদের মেরে কেটে গয়না গাঁটি যা ছিলো কেড়েকুড়ে---ওকি মনুয়া, মুখ ঢাকছিস কেন ? আচ্ছা, আচ্ছা, গয়নাগাঁটি না-ই নিলি। তাছাড়া সে সব নেইও। মোহর নিবি ? থোলো-থোলো সোনার মোহর ? একটাও ডাকাতি করে পাওয়া নয়। রাজা ছিলো রে আমার ঠাকুরদা। ওদের বাড়িতে সবাই দুধে চান করতো, সোনার খাটে বসে রূপোর খাটে পা রাখতো, তক্‌মাপরা দাস দাসীরা সোনাবাঁধানো চামর দোলাতো।

মনুয়া বললো, কোথায় পেতো থোলো-থোলো সোনার মোহর ওরা ?

বুড়ো দাদু হেসে বললেন, ওমা তাও জানিস নে বুঝি ?

প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হতো যে, না দিয়ে সব যাবে কোথা !

ধান কেটে, ঘর জ্বালিয়ে---

ওকি মনুয়া, কাঁদছিস নাকি ? আচ্ছা, মোহর নাই নিলি, সে সব হয়তো খরচও হয়ে গিয়েছে এদ্দিনে। তুই বরং এই মোটা কাচের কাগজচাপাটা নে। বুড়ো দাদু মোটা কাচের কাগজচাপা উঁচু করে তুলে ধরেন। বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে মাদুরে শুয়ে মনুয়া সেই কাচের মধ্যে দিয়ে ঘন নীল আকাশ দেখতে পায়। কাচের ওপর রোদ পড়ে, ধার দিয়ে রামধনুর রং ছিটোয়। রামধনুর রং এসে বুড়ো দাদুর গায়ে, মনুয়ার গায়ে বেগুনি, নীল, কমলা, লাল রঙের আঁকিবুঁকি কাটে। পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে। পেয়ারা গাছের আঁকা-বাঁকা ডালপালার ছায়া ওদের গায়ে এসে পড়ে।

মা এসে বাটি করে ওদের জন্য গরম দুধ, পাঁউরুটি আর নরম নরম লাল চিনি দিয়ে যান। বলেন, ও মনুয়া, কাল তোর জন্মদিন কাঁকরদের নেমন্তন্ন করে আসিস।

মনুয়া বলে, কাল বুড়ো দাদুরও জন্মদিন। বুড়ো দাদুও কাঁকরদের নেমন্তন্ন করবে।

॥ চরণিক ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ যখন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হল, তখন ইয়োরোপ এই যন্ত্রপাতি এবং আধুনিকতার উপর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে। জার্মানীর অবস্থা তখন অতি ভীষণ। একে যুদ্ধে হেরে গেছে, তার উপর দেশে খাবার নেই, পয়সা নেই। মানুষ কি নিয়ে থাকবে, কি নিয়ে আমোদ করবে, এই এক মস্ত সমস্যা।

স্কুল ও ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েদের যুদ্ধের আগে আমোদ-প্রমোদের প্রধান জায়গা ছিল সিনেমা, থিয়েটার, নাচের মজলিস, কাফে। যুদ্ধের পর এই আমোদের উপায়গুলো কেমন যেন অর্থহীন, অস্বাভাবিক মনে হতে লাগল। তা ছাড়া ইচ্ছে থাকলেও কার্ণিভালে আর নাচের মজলিসে যাবার পয়সাও এদের মধ্যে বিশেষ কারুর ছিল না। অথচ আমোদ না হলে ছেলে-মেয়েরা বাঁচে কি করে? আমোদ চাই, কিন্তু সহজ, স্বাভাবিক আর বিশেষ করে সস্তা চাই।

হাঁটার মধ্যে যে কোন আমোদ আছে এ লোকে একেবারে ভুলে গিয়েছিল.। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেলো, একদল জার্মাণ ছেলে-মেয়ে পিঠে বোঁচকা নিয়ে হাঁটতে সুরু করে দিয়েছে! আজকালকার দিনে বাড়ি থেকে বেরনো মানেই পয়সার শ্রাদ্ধ। যেখানেই রাত কাটাও হোটেলের খরচ আছে, তারপর খাবার খরচ, তদুপরি বখশিষ। কিন্তু এই সব ছেলে-মেয়েরা অত পয়সা পাবে কোথা থেকে? হোটেল আর রেস্তোরাঁর পাট এরা তুলে দিলে। বড় বড় সহরের হোটেলে যাবার গরজ বোধ করলে না এরা। এরা চল্লো ছোট-ছোট নির্জন গ্রামে রাত কাটাতে-কাটাতে। চাষীদের বাড়িতে মাচার উপর যেখানে ঘোড়ার খাবার বিচালি জমা থাকে সেখানেই সামান্য পয়সা দিয়ে শোবার ঠাঁই করে নেয় কেউ। কেউ ঘাড়ে করে তাঁবু নিয়ে পাইনের পাতা বিছিয়ে বিছানা করে নিয়ে রাত কাটায়। খাবারের খরচ কমাবার জন্য পোঁটলার মধ্যে উনুন নিতে হল,

আর সাধাসিধে খাবারের কিছু-কিছু উপকরণ। এতে পিঠে রীতিমতো বোঝা বয়ে চলার শ্রম থাকলেও দেখা গেল হোটেল, রেল ইত্যাদির চেয়েও আমোদ হচ্ছে বেশী। গ্রামে গিয়ে সব চেয়ে সস্তায় কি ভাবে রাত কাটানো যায়, আর গাছের তলায়, ঝর্ণার ধারে কি ধরণের খাবার খেলে সবচেয়ে সস্তায় সারা যায় এই নিয়ে এরা রীতিমতো চর্চা সুরু করলে।

দেখতে-দেখতে এদের দল বেড়ে উঠল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দিনের পর দিন সুন্দর গ্রাম, সুন্দর পাহাড় আর সুন্দর পাইন-বন খুঁজে বেড়ানো যে কি আমোদ আর নিজের হাতে রাঁধা-বাড়া করা, বিছানা করা, তাঁবু খাটানো আর বিষম ভারী মোট বওয়ার যে কি স্ফূর্তি এটা সবাই হঠাৎ বুঝে ফেল্লে। জার্মাণীর এক সীমা থেকে আর এক সীমা পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা দলে-দলে যেন হাঁটুরে বিদ্যাতে পাকা হয়ে উঠল। সে সময় এদের বলা হত 'ভাণ্ডার ফোগেল'।

অতি শীঘ্রই এটা একটা দেশব্যাপী আন্দোলন হয়ে দাঁড়াল, এবং জার্মাণী থেকে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে এবং শেষে ইংলণ্ডে পর্যন্ত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে সব দেশে এদের এক-একটা সম্মিলন খাড়া হয়ে গেল। চাঁদা হল যৎসামান্য—কিন্তু দলে ভারী হওয়ায় তারা এই চাঁদা এক জায়গায় জমা করে অনেক কিছু করতে পারলে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, দেশের মধ্যে যে-সমস্ত সুন্দর-সুন্দর জায়গা আছে সেখানে ডাকবাংলোর মতো ছোট ছোট কুটির নির্মাণ করা, হাঁটিয়েদের রাত কাটাবার জন্যে। এর মধ্যে সৌখিনত্ব বা বিলাসিতার কিছুই ছিল না—তার প্রয়োজনও ছিল না, উপায়ও ছিল না। দেশের নির্জন সুন্দর জায়গায় বহু পোড়ো বাড়ি, পোড়ো কারখানা, ভাঙ্গা চালাঘর প্রভৃতি পড়ে ছিল—সেই সবগুলো এদের খুব কাজে এল। এমনি ধরনের কিছু-কিছু সম্পত্তি এরা সস্তায় কিনলে; কোন কোন ভাঙা বাড়ি সহৃদয় জমিদারের কাছ থেকে দান হিসেবেও পেল। এদের জোড়াতালি দিয়ে সারিয়ে নিয়ে হাঁটিয়েদের রাত কাটাবার ঠাঁই হল।

যে সকল জায়গায় লোকে হেঁটে বেশী আনন্দ পাবে সেই সব জায়গাতেই বেশী কুটির হল। এই কুটির থেকে আর এক কুটিরে যাবার সুদীর্ঘ পথে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করতে নতুন কুটির করতে হল। যেমন বড়-বড় রাস্তায় কিছু

কিছু দূরে-দূরে সরাইখানা থাকে, ঠিক সেইরকম। এমনিভাবে সারা দেশ জুড়ে হাঁটিয়েদের কুটিরের জাল ছড়িয়ে পড়ল।

আস্তানার ব্যবস্থা হবার পর থেকে এদের দলকে সাধারণতঃ বলা হত Youth Hostel Association এবং আস্তানাগুলির নাম হল Youth Hostel। এমনি ইয়ুথ হস্টেল জার্মাণীতে দু'হাজার আছে, ইংলণ্ডে অছে তিনশো, ডেনমার্কের মতো ছোট্ট দেশে আছে দুশো।

ইয়ুথ হস্টেলে রাত কাটাবার খরচ খুব কম। তাছাড়া যারা চাঁদা দিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হয়েছে তাদের পক্ষে আরও কম। প্রত্যেক হস্টেলে রান্নাঘর আছে, সেখানে সভ্যেরা এসে রেঁধে খায়। কোন কোন হস্টেলে সস্তায় খাবারও পাওয়া যায়।

এইভাবে নানা দেশে ইয়ুথ হস্টেলে গড়ে উঠবার পর এক দেশের হাঁটিয়েরা অন্যদেশের হাঁটিয়েদের দলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আরম্ভ করলে। এক দেশের অ্যাসোসিয়েশানের সভ্য হলে অন্য দেশের হস্টেল ব্যবহার করবার সুযোগ পাওয়া যেতে লাগল।

এইসব ধরণের ব্যবস্থা হওয়ার পর ইয়োরোপে এ-যুগের হাঁটিয়েদের পক্ষে হাঁটার কষ্ট অনেক কমে গেছে। সামান্যপয়সা নিয়েই লোকে আজকাল হেঁটে দেশ বেড়াতে পারে, এমন কি দূর দেশ দেশান্তরে যাওয়ার সত্যিকারের কষ্ট বা বিপদ কিছু নেই। আজকাল তাই গ্রীষ্মকালে ইয়োরোপের যে কোন দেশে দলে দলে বোঁচকা পিঠে নেওয়া হাঁটিয়ে দেখা যায়---অবশ্য সহরের মধ্যে নয়, গ্রামে, মাঠে, আর বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে।

পদ্যাংশ

রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ

॥ কৃত্তিবাস ওঝা ॥

রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ।
আশীর্বাদ করি দিল বসিতে আসন॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ।
সভাস্থ সকলে শুদ্ধ করিছে শ্রবণ॥
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ।
রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে আপদ॥
যত দিন সীতারে আনিলে লঙ্কাপুর।
তত দিন দেখি ভাই কুস্বপ্ন প্রচুর॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গৃহচালে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় শৃগালের রোলে॥
কালী হেন বুড়ি দেখি দশন বিকট।
সন্ধ্যাকালে উঁকি মারে দ্বারের নিকট॥
বিবিধ উৎপাত ভাই দেখি সদাকাল।
রামচন্দ্র অতি বীর বিক্রমে বিশাল॥
রাবণ বলিছে রামেরে এত ডর।
কি করিতে পারে রাম সুগ্রীব বানর॥
রাবণ ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কানে।
মন্ত্রণা করিতে দুষ্ট মন্ত্রিগণ আনে॥
রাবণ বলিছে মন্ত্রি যুক্তি কর সার।
কি প্রকারে রাঘবেরে করিবে সংহার॥
বীরদর্পে কহিছে প্রহস্ত সেনাপতি।
কি করিতে পারে সে বনের পশুজাতি॥

পর্বতের গুহা আর যত নদীকূলে।
বানরের নাম না রাখিব ভূমণ্ডলে॥
বজ্রকন্ঠ নিশাচর দশন বিকট।
লোহার মুষল হাতে কহে অকপট॥
লোহার মুষল লয়ে প্রবেশিব রণে।
মাথা ভাঙ্গি বানর বধিব জনে জনে॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে আমি আছি কিসে।
লঙ্কাতে থাকিতে আমি কোন্ বেটা আসে॥
বন ভাঙ্গে লঙ্কা দাহ করে হনুমান।
লঙ্কায় থাকিতে আমি এত অপমান॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা আমি করি রণ।
দেখিব কেমন রাম কেমন লক্ষ্মণ॥
অকম্পন বলে রাজা তব আজ্ঞা পাই।
অনেক দিনের সাধ কপি ধরি খাই॥
কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
উভয়ের কত দর্প করিবারে রণ॥
জাঠি জাঠা বাকড়া মুষল শেল আর।
লইয়া সাজিল যুদ্ধে লাগে চমৎকার॥
হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে জনে।
স্থির হও স্থির হও শুন বীরগণে॥
এ সবার বাক্যে ভাই না করিহ ভর।
হিতবাক্য বলি ভাই শুন লঙ্কেশ্বর॥
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়।
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয়॥
কোন্ কার্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী।
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী॥

এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে।
কুপিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥
বিভীষণ যেন জ্যেষ্ঠ আমি ত কনিষ্ঠ।
আমি অধর্মিষ্ঠ বড় সে বড় ধর্মিষ্ঠ॥
মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ।
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন॥
বিভীষণে দূর কর যুক্তি করি সার।
যুদ্ধ বিনা গতি নাই কিসের বিচার॥

মেঘনাদবধ কাব্য

॥ মধুসূদন দত্ত ॥

প্রথম স্বর্গ

কনক-আসনে বসে দশানন বলী---
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্ নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা---স্ফটিকে গঠিত ;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,

বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভাসম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা!
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি। মন্দ মন্দ বহে গন্ধ বহি,
অনন্ত-বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী-লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে।
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে কৌরবে?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্বকলেবর।

বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল-তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, যেন আবরিল
দিননাথে। কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল-সমরে?
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষ, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর। হব আমি নির্মূল সমূলে

এর শরে। তা না হ'লে মরিত কি কভু
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত---
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায় ইচ্ছা করে
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মরলী
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

ভারত-সংগীত

॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

"আর ঘুমাইয়ো না, দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী,
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানব জাতিরে লয়ে।

মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।...

বাজ্‌রে শিঙা বাজ্‌ এই রবে—
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই কথা বলি, মুখে শিঙা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে, গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গায়িতে লাগিল জনৈক যুবা।

আয়ত-লোচন, উন্নত-ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে, গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!

আর্যাবর্তজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা?

হীনবীর্য-সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হ্যাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার!

এসেছিল যবে আর্যাবর্তভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্বপিতৃগণ,
যখন তাহারা করেছিল রণ
করেছিল জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা ক'জন ছিল?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা ক'জন ছিল?

এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে-হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

তবে ভিন্নজাতি-শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হ'তে করিস্ না মন?

অই দেখ্, সেই মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্যাবর্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনও উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনও ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু-বীরদর্প, বুদ্ধি-পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর-জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?

সকলি তো আছে সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই?

প্রবল-তরঙ্গ সে উন্নতি কই?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা!

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি,
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!—
আর কি ভারত সজীব আছে?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীরপদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে।...

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।

জপ, তপ, আর যোগ, আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা,
এ সকলে আর কিছুই হবে না,
তূণীর-কৃপাণে কর পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে,
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী-সহ সমকক্ষ হতে,

স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্যসিদ্ধ হত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সেদিন নাহিত রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না, হবে না—খোল্ তরবার;
এ-সব দৈত্য নহে তেমন।

বাজ্ রে শিঙা, বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

———

ভারতের মানচিত্র

॥ যোগীন্দ্রনাথ বসু ॥

শিক্ষক। হের বৎস, সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই। মাতৃস্তন্যে যথা,
এ দেশের ফলে জলে পালিত আমরা।
করো প্রণিপাত তুমি, করো প্রণিপাত।

ছাত্র। (প্রণাম) ঐ যে চিত্রের শিরে ঘন মসীরেখা
পূরব-পশ্চিম ব্যাপি রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার দেব, বলুন আমারে।

শিক্ষক। নহে তুচ্ছ মসী-রেখা; ওই হিমাচল
ভারতের পিতৃরূপী! জনক যেমন
স্নেহদানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমনি এ হিমাচল-দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহ-ধারা-দানে
পালিছেন সযতনে। ওই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র; কত সাধুজন,
বিরচি আশ্রম সেথা, পূজি ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর! সম্মুখেতে তব
বিজয়-মুকুট-সম এ অদ্রির শিরে
শোভে ওই গৌরীশৃঙ্গ। দেখো বাম দিকে
ওই বদরিকাশ্রম, মহামুনি ব্যাস
বসি যে আশ্রম-মাঝে রচিলা পুলকে
অমর ভারত-কথা। অবিদূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ। আচার্য শঙ্কর

জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন
লভিলা সমাধি যেথা। এই হিমাচল
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি যুগ যুগ
হইয়াছে পুণ্যভূমি। করো নমস্কার।

ছাত্র। (প্রণাম) ঐ যে চিত্রের বামে পঞ্চরেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার?

শিক্ষক। ওই পঞ্চনদ, বৎস, এই পুণ্যভূমি
আর্যদের আদি বাস, সাম-নিনাদিত,
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়শোণিত ঢালি বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি---মরুময় স্থান;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদী-কূলে,
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস! আত্ম-বিসর্জন;
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি!

ছাত্র। ওই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধসম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার?

শিক্ষক। এই বিন্ধ্যাচল, বৎস! উত্তরে উহার
আর্যভূমি আর্যাবর্ত। উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্যের বাস; অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারে পূর্ণ! মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য আর্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে
শোভিছে এ দেশ-মাঝে! এই বনভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য; রঘুকুলমণি

পালিবারে পিতৃসত্য, জটা-চীর ধরি,
কাটাইলা কাল যেথা। পূণ্যপ্রবাহিণী
গোদাবরী, কল-কল মধুর নিনাদে,
'সীতারাম জয়' গীত গাহিয়া পুলকে
এখনো বহেন সেথা। পবিত্র এ দেশ
সীতারাম-পদ স্পর্শে। করো নমস্কার!

ছাত্র। (প্রণাম) গুরুদেব, কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ। কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি আজ দেখান আমারে।

শিক্ষক। ওই বঙ্গভূমি, বৎস, হিমাদ্রি আপনি
মুকুট-আকারে, হের, শোভে শিরোদেশে;
ধৌত করি পদতল বহেন জলধি;
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে
'সুজলা' 'সুফলা' 'শ্যামা'। ভূষারূপে তার
হের ওই নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যেথা
হইলেন অবতীর্ণ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে,
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা;
অমর করিলা জীবে! পশ্চিমে তাহার
দেখো শুষ্কতনু ওই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে। নিম্নদেশে তার
সাগর-সংগম ওই, পতিতপাবনী
তারিতে সগরবংশ অবতীর্ণা যেথা
মূর্তিমতী দয়ারূপে! পবিত্র এ দেশ,
কর প্রণিপাত তুমি। বিধাতার কাছে
মাগো এই বর বৎস, মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি-মায়ে।

ছাত্র। বিশাল এ চিত্র দেব। কৃপা করি তবে
দেখাও দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে।
শিক্ষক। আছে শত-শত, বৎস, কি বর্ণিব আমি ?
বর্ণিলে জীবনকালে না ফুরাবে তবু।
রত্নপ্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল, পাদমূলে তাঁর
দেখো শীর্ণকায়া ওই বহিছে রোহিণী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী। তটদেশে তার
আছিল কপিলাবস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে। দেখ বাম দিকে
অর্ধচন্দ্র-কায়া ওই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী হরিশ্চন্দ্র যেথা
পত্নী পুত্রে আপনারে করিয়া বিক্রয়
পালিলেন নিজ সত্য। দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত গৌরব-স্মৃতি-শিলা ধরি বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী—বিক্রমের পুরী—
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যেথা
গাহিলা অমর-গীত, ঝংকার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস, দেশ দেশান্তরে।
কি অধিক কব ? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের—
নয়নে অমৃত-দৃষ্টি, কন্ঠে মধুবাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময় ;
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ।
তেমতি জানিও বৎস, ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
পূণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত

প্রতি রেণুমাঝে এর, প্রতি জলকণে,
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত।
সামান্য এ দেশ নয়! বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে! কিন্তু চিরদিন
রাখিয়ো স্মরণ, বৎস, কর্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথাই জনম তব। কি বলিব আর!

দীন দান

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

নিবেদিল রাজভৃত্য, 'মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয়, আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উদ্‌বেলিত আনন্দ ধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধুলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমল গন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসা-ভরে, সেইমত নরনারীগণে
সোনার দেউল পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি

বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ।   রত্ন বেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে'।
শুনি রাজা ক্ষোভ ভরে

সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি তাঁর পায়,
'হের প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়---তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে?'

'সে মন্দিরে দেব নাই' কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে,
'দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন'পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ---
শূন্য তাহা?'

'শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ' সাধু কহে,
'আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।'

ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, 'বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাহি কোনো স্থান?'

শান্ত মুখে কহে সাধু, 'যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন,
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,

অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সে দিন কহিলা ভগবান,—
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা-মাঝে ; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম ; দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান !' চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে ;
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ।'

রাজা জ্বলি রোষানলে,
কহিলেন, 'রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্তে চলি যাও।'

সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
'ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত কর ভক্তজনে।'

প্রভাত-উৎসব

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা সখী বসিয়া চোখোচোখি,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন পুলকে ভরা মন,
ডাকিছে 'ভাই ভাই', আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখীরা এল ছুটে, নয়নে তারা ফুটে,
পরানে কথা উঠে—বচন গেল ভুলি।
সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে,
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।
শিশুরে লয়ে কোলে জননী এল চলে,
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে 'ঘুমো ঘুমো'।
আনত দু'নয়ানে চাহিয়া মুখপানে
বাছার চাঁদমুখে খেতেছে শত চুমো।
পুলকে পূরে প্রাণ, শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর—
এসেছে রবি শশী, এসেছে কোটি তারা,
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরান পূরে গেল হরষে হল ভোর
জগতে যারা আছে সবাই প্রাণে মোর।

প্রভাত হল যেই কী জানি হল একী
আকাশপানে চাই কী জানি কারে দেখি।
প্রভাতবায়ু বহে কী জানি কী যে কহে,
মরমমাঝে মোর কী জানি কী যে হয়!
এস হে এস কাছে সখা হে এস কাছে—
এস হে ভাই এস, বসো হে প্রাণময়।
পূরব মেঘমুখে পড়েছে রবি রেখা,
অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখির কলরব
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব!
মধুর মধু আলো, মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বয়ে যায়!
যে দিকে আঁখি চায় সে দিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

সভ্যতার প্রতি

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,

গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার-ধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব,
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরানে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।

খর বায়ু বয় বেগে

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

খর বায়ু বয় বেগে,
চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।

তুমি কষে ধরো হাল,
আমি তুলে বাঁধি পাল---
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥

শৃঙ্খলে বারবার
ঝন্‌ঝন্‌ ঝংকার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার---

বন্ধন দুর্বার
সহ্য না হয় আর,
টলমল করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

গণি গণি দিন খন
চঞ্চল করি মন
বোলো না, যাই কি নাহি যাই রে।
সংশয়পারাবার
অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।

যদি মাতে মহাকাল,
উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুন্ঠিত, ঢেউ ওঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুন্ঠিত,
তালে তার দিয়ো তাল,
জয়-জয়-জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধূলায় সে যায় বয়ে—
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ,
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান॥

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে—
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে
সবারে না যদি ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

পাছে লোকে কিছু বলে

॥ কামিনী রায় ॥

করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয় সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্‌ মত
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি,
নিরমল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা—
চলে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

মহৎ উদ্দেশ্য যবে
এক সাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে
পাছে লোকে কিছু বলে !

বিধাতা দেছেন প্রাণ,
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

———

ভারত-সঙ্গীত

॥ অতুলপ্রসাদ সেন ॥

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নতশির, নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদজ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান্;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান,
জগজন জানিবে বিস্ময়!
জগজন মানিবে বিস্ময়!

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন;
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন।
ওই দেখো প্রভাত-উদয়,
ওই দেখো প্রভাত-উদয়।

ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে—
সত্যের নাহি পরাজয়,
সত্যের নাহি পরাজয়!

বর্ষায়

॥ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে ঢল্,
আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা---বড় চঞ্চল
বড় দুরন্ত মেয়ে।

ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশথের তলে বসে নাক' হাট,
সারা দিনরাত বৃষ্টির ছাট
ঝরিতেছে একঘেয়ে।

ভাসিল পুকুর, আউসের ভুঁই,
পালায় কাত্‌লা কালবোস রুই,
আঙিনায় জল করে ছলছল,
ব্যাঙ্ ডাকে, হাঁস চরে।

কাঁঠালি-চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল-বাতাস;
গাছ ভরা জাম সুচিকণ শ্যাম
ফেটে যায় রসভরে।

ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই,
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই---
চলে গেছে চিল, গগনের নীল
গলে' গেছে জল-ধারে।

রাঙা আঁখি মেলি আনারস-রাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত-তাজ;
নেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ
চন্দন-দীঘি-পারে।

বর্ষা

॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগ্‌লি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে!
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই!

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে!

বজ্র হাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায়;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে!

ময়ূর বলে 'কে গো' ?   এ যে আকুল-করা রূপ !
ভেকেরা কয় 'নাই কোন ভয়', জগৎ রহে চুপ ;
পাগ্‌লি হাসে আপন মনে পাগ্‌লি কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায়।

কোন্ মোহিনীর ওড়্না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুমিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে ;
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ,
ঘুম-পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস !

বাদল্ হাওয়ায় আজকে আমার পাগ্‌লি মেতেছে ;
ছিন্ন কাঁথা সূর্যশশীর সভায় পেতেছে !
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত !

বংশগৌরব

॥ কুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥

জায়গীর আর লক্ষ টাকার তন্‌খা দিবেন তারে
যদি কোনো জন 'বান্দা' বীরের সন্ধান দিতে পারে।
গোপন করিয়া রাখিবে যে তারে, যাবে তার ধন-প্রাণ,-
ঢোল-সহরেতে জানাইয়া দিল নবাবের ফরমান।
বরষের পরে 'সিপাহসালা'-রে জানালো গুপ্তচর,
জানে সন্ধান বালক জনৈক,—দূর পল্লীতে ঘর।

সংবাদ পেয়ে অশ্বে আরোহি' সেনানী দেখেন গিয়া,
প্রিয়-দর্শন কৃষককুমার যায় মরুপথ দিয়া।
রাজ-অশ্বের গতি-সৌষ্ঠব ভুলালো বালক-মন,
দূর হ'তে কাছে আগাইয়া এলো করিতে নিরীক্ষণ।
সেনানী তাহারে ডাকিয়া নিকটে বলেন, 'চড়িবে, চড়—
কিন্তু ঘোড়াটি সাম্‌লানো দায়, তেজী ও দুষ্ট বড়।'
বালক হাসিয়া চাপি' সে অশ্বে অগ্নি ছুটায়ে খুরে
মুহূর্তে এলো নিপুণ সওয়ার মাইল দু'-এক ঘুরে।
সাবাসি' তাহারে কাছে বসাইয়া দিয়া মোহরের তোড়া,
এবং তাহার আকাঙ্ক্ষিত যে-সাজানো আরবী ঘোড়া,
বলেন সেনানী, 'কোথায় বান্দা? সংবাদ বল তার,
দিলাম যা তার দশগুণ পাবে অধিক পুরস্কার।'
মাত্র বয়স দ্বাদশ বর্ষ—ক্ষুদ্র বালক শিখ
"জানি আমি বটে—বলিব না" বলি' দাঁড়াইল নির্ভীক।
'নাথু সিংহের বংশে জনম, উহা কি মোদের শোভে?
হীন কাজ কেহ করিতে পারিনে পুরস্কারের লোভে।'
রুষিয়া সেনানী পৃষ্ঠে তাহার চাবুক মারিল জোরে,
চাবুকের পরে চাবুক চালায়—বালক তবু না নড়ে।
চোখ ফেটে জল টস্ টস্ পড়ে, পড়ে সে ধূলোয় লুটি'
'জানি আমি বটে, বলিব না', ফের দাঁড়ায়ে বলিল উঠি'।
সুন্দর দেহে রাঙা-রাঙা দাগ, শোণিত-বিন্দু ঝরে,
কঠোর কঠিন সোনালী-হৃদয় তাহাও কেমন করে!
তবু নির্দয়, তবু নির্মম, প্রহারে ঘাতকবৎ,
দয়া দেখাইতে দেয় না কঠোর কর্তব্যের পথ।
খুলি' তরবারি বলেন, সেনানী, 'বলে দাও সন্ধান,
নতুবা ইহার একটি আঘাতে লইব তোমার প্রাণ।'

বালক বলিল, 'গোপন কাহিনী গোপন রাখিতে জানি
নাথু সিংহের বংশীয় মোরা, করিনে কাহারো হানি।
জয় গুরুজীর! অনিষ্ট করা! করিবে করুক যারা,
জননী বলেন, হয়নি, এবং হবে না মোদের দ্বারা!'
সেনানী দারুণ বিস্মিত হয়ে ধরিয়া চুলের মুঠি
বলেন, 'এটা তো বালক নয়কো, আগুনের ফিন্‌কুটি!
দশ বিশ লাখ সৈন্য দেখেছি মহা-মহা বীর কেহ,
হেন দুর্জয় দেখিয়াছি কিনা হয় মোর সন্দেহ!
কৈশোর যার এত উজ্জ্বল, ভাবিতেছি আমি মনে
এ শিখের শিখা প্রখর কি হবে অনাগত যৌবনে!'
বলিলেন 'যাও সিংহ-শাবক, দিলাম তোমারে ছাড়ি;
লয়ে যাও তুমি, দিনু উপহার—এই প্রিয় তরবারি।'

* * * *

বালক বীরের এই যে কাহিনী এখনো চারণে গায়
গৌরব তার উজ্জ্বল করেছে বংশমর্যাদায়।
বংশধরেরা পূজে তরবারি —ভাবে তা' শ্রেষ্ঠ ধন,
দৃঢ়তার তাহা পুরস্কার—আর স্নেহের নিদর্শন।

———

চণ্ডালী

॥ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥

বৃদ্ধ খঞ্জ চণ্ডালী এক শ্রীমুখ দেখিতে রথে,
একাকিনী, হায়, চলে ধীরি-ধীরি মেদিনীপুরের পথে।
দিবসে যে শুধু হাঁটে এক ক্রোশ ,তাহার একি গো দায়,
গৃহ হতে দূরে একশত ক্রোশ পুরীধামে যেতে চায়।
দলে দলে চলে পুরীর যাত্রী, খোঁজ করে কেবা কার---
সেই সবাকার পিছু পড়ে' থাকে, চলিতে পারে না আর।
রথযাত্রার যবে শুধু আর দুই দিন বাকী আছে,
বহুকষ্টে সে পঁহুছিল সাঁঝে আসি কটকের কাছে।
"কোথা যাবি বুড়ী?"---পথিক জনেক সুধালে সেখানে তারে ;
বৃদ্ধা বলিল,---"চলিয়াছি বাবা চাঁদমুখ দেখিবারে।"
ঈষৎ হাসিয়া কহিল সে জন,---"কেমনে পারিবি বুড়ী,
রাত পোহালে যে কাল রথ, খেপী, দেখিবি কেমন করি'?"
শুনি চণ্ডালী রুষিয়া বলিল,---"বাকি যে এখনো পথ,
কি বলিছ তুমি, রাতি পোহাইলে কেমনে চলিবে রথ!"
হাসিয়া পথিক বলিল,---"তাইত, চল্ তাড়াতাড়ি চল্---
তুই খেপী যদি না যাইবি সেথা রথ কে টানিবে বল্?"
ঘুমাইল বুড়ী, রজনী প্রভাতে উঠে বলে,---"চল যাই"---
দুটি পা তাহার বেদনা-জড়িত উঠিতে শকতি নাই।
আড়ষ্ট ব্যথা, পারে না নড়িতে, তবু দিয়া হামাগুড়ি,
রথেতে দেখিবে শ্রীমুখ বলিয়া চলিতে লাগিল বুড়ী।
ভক্ত কত না জুটেছে শ্রীধামে, রথযাত্রা যে আজি,
কাঙালের হরি উঠেছেন রথে অভিনব বেশে সাজি'।
একি অঘটন, একি হলো আজ, চলে না দেবের রথ!
অযুত ভক্ত টানে রশি ধরি' কর্দমহীন পথ।
জুড়িল হস্তী, তবু যে গো রথ তেমনি রহিল থির ;

ভাবনা-ব্যাকুল প্রধান পাণ্ডা, ঝরে নয়নের নীর।
ধূলার মাঝারে লুটায়ে পাণ্ডা জানিতে পারিল ধ্যানে---
প্রবল ভক্ত কে এক রথের পশ্চাৎ দিকে টানে।
যাবৎ না ছোঁয় সমুখের রশি পূত করতল তার,
হাজার হস্তী রথের চক্র নড়াতে নারিবে আর।
বাহির হইল পাণ্ডার দল ভক্ত অন্বেষণে,---
কৌপীন-পরা সন্ন্যাসী যত ধ'রে আনে জনে জনে,
তিলক-ভূষিত নামাবলী-ধারী বৈষ্ণব আনে ধ'রে,
কাহারো পরশে সে বিরাট রথ এক তিল নাহি নড়ে।
খুঁজিতে খুঁজিতে বহুদূর আসি' প্রধান পাণ্ডা, হায়,
দেখিল খঞ্জ বৃদ্ধা জনেক পুরী অভিমুখে যায়।
হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে বুড়ী ; পাণ্ডা সুধা'ল তারে---
"এ খর রৌদ্রে ভিক্ষার লাগি যাইবি কাহার দ্বারে?
তপ্ত বালুতে পুড়িতেছে পথ, আঁখি ভ'রে গেছে জলে,---
দিনু এই সিকি, ফিরে গিয়ে বস্ ওই অশথের তলে।"
বুড়ী বলে,---"বাবা, বল কবে রথ, পয়সাতে কাজ নাই,
রথেতে দেখিব শ্রীমুখ বলিয়া রোদে চলিয়াছি তাই।"
শুনি ব্রাহ্মণ কাঁদিতে-কাঁদিতে বৃদ্ধারে বুকে করি'
"পেয়েছি, পেয়েছি"---বলিয়া ছুটিল পুরীর সড়ক ধরি'।
ব্যাকুল বৃদ্ধা বলে,---"দাও ছাড়ি' বাবা গো চাঁড়াল মুই।"
ব্রাহ্মণ বলে,---"দে মা পদধূলি, গুরুর গুরু যে তুই।"
চকিতে দেখিল যাত্রীরা সবে, "জয় জয় জয়" ব'লে---
প্রধান পাণ্ডা আসিল রে সেই খোঁড়া বুড়ী লয়ে কোলে।
অচল সে রথ চলিতে লাগিল, বুড়ী দিল যবে হাত---
উল্লাসে সবে গাহিয়া উঠিল---"ধন্য জগন্নাথ!"
সাশ্রু-নয়নে অযুত ভক্ত গাহিল ভক্ত-গান---
'সত্যই তুমি কাঙালের হরি, ভক্তের ভগবান!"

পুষ্প-জীবন

॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥

ফুল যবে ঝরে যায় ভেবেছ কি মরে যায়
শেষ হয় চিরতরে তার রূপ-সৌরভ ?
সে যে ফিরে-ফিরে আসে বছরের সেই মাসে—
দেখ না কি সেই রঙ্, সেই শোভা, সেই সব।
ফাগুনে অশোক-শাখে যে সব কোকিল ডাকে,
আকাশে যে চাঁদ হয় বারে বারে পূর্ণ,
আষাঢ়ে মাঠের শেষে নীল মেঘ ওঠে ভেসে,
অঘ্রাণে তৃণে-তৃণে সেই হীরা-চূর্ণ ;—
বলো, সে কি মনে হয়, তারা সব এক নয় ?
আগেকার থেকে তারা একতিল ভিন্ন ?
মরে' তারা বাঁচে ফের, পাছে কেউ পায় টের—
তাই কোথা নাহি রাখে মরণের চিহ্ন।
ফুলেদেরো ঠিক তাই! তারা তো মরে না, ভাই,
যখন যেখানে ফোটে—সেই নাম, সেই ফুল!
তারা যে আপন জন, ধরার বুকের ধন—
মাটিতে জনম যার অমর তাহার মূল!
তারা যে শুধুই হাসে, ভালবাসে কি না বাসে,
শুধায় না কেউ কারে, তবু সদানন্দ ;
বলে না যে সুখ চাই, তাই কারো দুখ নাই,
ভুলেও ভাবে না, কিবা ভালো কিবা মন্দ।
ওদের মুখের 'পরে শুধু আলো খেলা করে,
শিশিরে কাঁদে না ওরা—বাড়ে তায় সৌরভ।
একসাথে ফোটে ঝরে ঝরে, তবু নাহি মরে,
ওরা যে সবাই এক—তাই হেন গৌরব।

প্রাচীন ভারত

॥ কালিদাস রায় ॥

প্রাচীন যুগের এই ভারতের ইতিহাস পড়ি
পরিতৃপ্ত নহে মন, জন্মে ক্ষোভ তথ্য-দৈন্য স্মরি'
ভগ্ন-শীর্ণ শিলালিপি, জীর্ণ মুদ্রা, তাম্রের ফলক,
দূর হ'তে ভাসাভাসা দেখে শুনে চীন পর্যটক
টিপ্পনী যা লিখে গেছে কড়চায় কবে লীলাচ্ছলে,
ইষ্টক-শিলার স্তূপ মিলেছে যা, খননের ফলে
---এই ত সম্বল শুধু। তাই দিয়ে জোড়া অতি ক্ষীণ
সূত্রহারা, ছন্নছাড়া, পরম্পরা-শৃঙ্খলাবিহীন---
কৃচ্ছ্রলব্ধ ইতিবৃত্ত, তাতে মন তৃপ্তি নাহি মানে!

মনে হয় ধমণীর রক্তধারা ঢের বেশী জানে
এর চেয়ে। উড়ে যায় সেই যুগে কল্পনা আমার,
শিল্পসাহিত্যের পথে, ব্যাহত কে করে গতি তার?
স্বপ্নের মাধুরী দিয়ে ভ'রে তোলে সব ব্যবধানে
প্রাচীন ভারত পুনঃ গড়ে তোলে নব উপাদানে।

সে স্বপ্নে ভারতে হেরি নরনারী বসন্ত উৎসবে
মাতে ফাল্গুনের দিনে। নব মেঘোদয় হয় যবে
গগন-দিগন্ত ভরি, দূতরূপে মেঘেরে বরিয়া
কূটজ কুসুমরাশি অর্ঘ্য দিয়া অঞ্জলি ভরিয়া
পাঠায় বিরহী তার দয়িতার লাগি আকিঞ্চন।
উদয়ন-কথা কয় গৃহদ্বারে গ্রামবৃদ্ধগণ।
প্রতিটি মুহূর্ত তারা জীবনেরে করে উপভোগ,
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ, নাহি দৈন্য, নাহি শোক-রোগ।

অর্হৎ শ্রমণগণ শ্রাবকের দ্বারে দ্বারে গিয়া
দশশীল ব্যাখ্যা করে। আভরণ সজ্জা বিসর্জিয়া,
পরিয়া চীবরবেশ, নটীগণ হয় মহাথেরী,
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ। ছিন্ন করি সংসারের বেড়ী,
জুটে দলে দলে গৃহী সংঘারামে। বুদ্ধের শরণ
লভিয়া তাহারা করে ভিক্ষুব্রত দৈন্যেরে বরণ।

এদিকে স্বগৃহে রচি ব্রাহ্মণেরা অর্ধ তপোবন
পরাবিদ্যা লয়ে করে সারস্বত জীবন যাপন।
প্রতিটি মুহূর্ত তারা জীবনেরে করে যে সফল,
নাহি ক্ষোভ, নাহি লোভ, নাহি দ্বন্দ, নাহি কোলাহল।

অতীতের সে ভারত নিত্য মোরে দেয় হাতছানি
সে ভারতে ফিরিবার উপায় যে নাই তাহা জানি।
দূরগামী পাখী পুনঃ ফিরে আসে আপনার নীড়ে।
নদী কি তেমনি কভু তার পিতৃগিরিগৃহে ফিরে?

এ যেন মরুতে রয়ে সুমেরুর হেমস্বপ্ন দেখা।
এ যুগে জনতারণ্যে মনে হয় যেন আমি একা।
নির্বাসন-দণ্ড সহি হায় কোন অপরাধে বুঝি,
মনের মানুষ যারা তাদের পাই না যে খুঁজি।

শোণিতে ধ্বনিত মোর তাহাদেরই কলকন্ঠ ভাষ!
তাহাদেরই কেশবেশ-গন্ধে ভরে আমার নিঃশ্বাস।
তারা নাই, আছে সেই মেঘ, চন্দ্র, নদী, গিরি, বন,
করে মোরে জাতিস্মর, উচাটন করে মোর মন।

সে ভারত হেমপদ্ম তাহারি মৃণালকন্দ আমি,
পঙ্কে রহি তারি স্বপন আমি হেথা হেরি দিবাযামী।
টুটিয়া গিয়াছে আজ তার সে মৃণাল-দণ্ডখানি,
সূক্ষ্ম তন্তু ধরি তার এবে শুধু করি টানাটানি,
যত টানি তত বাড়ে, হায় মোর একি কর্মভোগ।
ব্যবধান বাড়ে বটে, ছিন্ন তবু হয় না সংযোগ।

পথচারী

॥ কাজী নজরুল ইসলাম ॥

কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
দু'-ধারে দু'-কূল দুঃখ-সুখের মাঝে আমি স্রোত-বারি!
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হ'তে
বিরাম বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হ'তে আন্ পথে।
নিজ বাস হ'ল চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণ পরে
বাহিরিনু পথে গিরি-পর্বতে—ফিরি নাই আর ঘরে।
পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিনু গিরি-কন্যার কোলে,
বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে আসিলাম ছুটে চ'লে।

জননীরে ভুলি' যে-পথে পলায় মৃগশিশু বাঁশী শুনি',
যে পথে পলায় শশকেরা শুনি' ঝরণার ঝুন্‌ঝুনি,
পাখী উড়ে যায় ফেলিয়া কুলায় সীমাহীন নভোপানে,
সাগর ছাড়িয়া মেঘের শিশুরা পলায় আকাশ-যানে,—
সেই পথ ধরি' পলাইনু আমি! সেই হ'তে ছুটে চলি
গিরিদরী মাঠ পল্লীর বাট সোজা বাঁকা শত গলি।

বাজিয়াছে মোর তটে-তটে জানি ঘটে-ঘটে কিঙ্কিণী,
জল-তরঙ্গে বেজেছে বধূর মধুর রিনিকি-ঝিনি।
বাজায়েছে বেণু রাখাল বালক তীর-তরুতলে বসি',
আমার সলিলে হেরিয়াছে মুখ দূর আকাশের শশী।
জানি সব জানি, ওরা ডাকে মোর দু'-তীরে বিছায়ে স্নেহ,
দীঘি হ'তে ডাকে পদ্মমুখীরা, থির হও বাঁধি'গেহ!'

আমি ব'য়ে যাই, ব'য়ে যাই আমি কুলু-কুলু-কুলু-কুলু,
শুনি না—কোথায় মোরই তীরে হায় পুরনারী দেয় উলু।
সদাগর-জাদী মণি-মাণিক্য বোঝাই করিয়া তরী
ভাসে মোর জলে, 'ছল ছল' ব'লে আমি দূরে যাই সরি'।
আঁকড়িয়া ধরে দু'-তীর বৃথায় জড়ায়ে তন্তুলতা,
ওরা দেখে নাই আবর্ত মোর, মোর অন্তর-ব্যথা!

জানিনাক' হায় চ'লেছি কোথায় অজানা আকর্ষণে,
চ'লেছি যতই তত সে অথই বাড়ে জল খনে খনে।
সম্মুখটানে ধাই অবিরাম, নাই নাই অবসর,
ছুঁইতে হারাই---এই আছে নাই—এই ঘর, এই পর।

ওরে বেনোজল, ছল্-ছল্-ছল্, ছুটে চল্ ছুটে চল্!
হেথা কাদাজল পঙ্কিল তোরে করিতেছে অবিরল।
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল্ চল্ পথচারী,
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত-সমুদ্র-বারি।

———

ভাড়াটে কুঠি

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥

নদীর স্রোতের জঞ্জাল সম আসিয়া জুটি।
ওধারে তাহারা, এধারে কাহারা, উপরে ও নীচে নানা ;
পাশাপাশি রোজ ঘর করি ভাই---কেহ নয় কারো জানা।
শুধু দু'বেলায় চোখোচোখি হয় একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি।
ভাড়াটে কুঠি ॥

ওধারের ঘরে তাহাদের ছেলে বুঝি বা ধুঁকিছে জ্বরে,
এধারে প্রবাসী স্বামীটির লাগি বধূটি শুকায়ে মরে।
নীচে মজলিসে সারাদিন গোল চলিছে দাবার ঘুঁটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥

একটি ইঁটের ব্যবধান রেখে পাশাপাশি থাকি শুয়ে ;
এ ছাতের জল ওছাতে গড়ায় ভিৎ গাড়া একই ভুঁয়ে।
ওইখানে শেষ ; তার পরে আঁটা জানালা কবাট দুটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥

একদিন ফের ঘুর্ণির টানে, কোনখানে যাই ভেসে---
কিছু নাহি জানি, তবুও বিদায় নিয়ে চলি ম্লান হেসে।
যা ছিল আড়াল রহে চিরকাল বাধা নাহি যায় টুটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥

শুধু কোনো দিন সঙ্গবিহীন বিদ্রোহ করে প্রাণ ;
কঠিন দেয়ালে করাঘাত করে ঘুচাইতে ব্যবধান।
ঘোচে না আড়াল, ব্যাকুল হৃদয় মিছে মরে মাথা কুটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥

মহাত্মাজীর প্রতি

॥ সুকান্ত ভট্টাচার্য ॥

চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে ; তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজী।
এখানে আমরা লড়েছি, মরেছি, করেছি অঙ্গীকার,
এ মৃতদেহের বাধা ঠেলে হব অজেয় রাজ্য পার।
এসেছে বন্যা, এসেছে মৃত্যু 'পরে যুদ্ধের ঝড়,
মন্বন্তর রেখে গেছে তার পথে-পথে স্বাক্ষর,
প্রতি মুহূর্তে বুঝেছি এবার মুছে নেবে ইতিহাস---
তবু উদ্দাম, মৃত্যু-আহত ফেলিনি দীর্ঘশ্বাস :
নগরগ্রামের শ্মশানে-শ্মশানে নিহিত অভিজ্ঞান :
বহু মৃত্যুর মুখোমুখি দৃঢ় করেছি জয়ের ধ্যান।
তাই তো এখানে আজ ঘনিষ্ঠ স্বপ্নের কাছাকাছি,
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি---
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে,
তোমাকে গড়ব প্রাচীর ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।
দিক্‌দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক,
তাই তো আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ॥

———

॥ লেখক পরিচিতি ॥

অতুলপ্রসাদ সেন

জন্ম ১৮৭১; মৃত্যু ১৯৩৪। পিতৃভূমি ঢাকা জেলা। ইনি লক্ষ্ণৌয়ে বিখ্যাত ব্যারিস্টার ছিলেন। ইনি অনেক গান রচনা করে' ও গানের সুর দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইনি নিজেও সুকন্ঠ গায়ক ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থ—কাকলি, কয়েকটি গান, গীতিগুঞ্জ।

'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটি 'গীতিগুঞ্জ' থেকে নেওয়া হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৮৭১; মৃত্যু ১৯৫১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতা গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ। তিনি সারাজীবন সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা করেছেন। চিত্রশিল্পী হিসাবে সারা পৃথিবীতে তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। কথাশিল্পী হিসাবেও তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ—শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা, রাজকাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, নালক ইত্যাদি। শিল্প বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ—ভারতশিল্প, বাংলার ব্রত, বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, ভারতশিল্পের মূর্তি ইত্যাদি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম ১৮২০; মৃত্যু ১৮৯১। জন্মস্থান—মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম। মৃত্যু—কলিকাতায়। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। 'বিদ্যাসাগর' তাঁর উপাধি। স্বদেশে শিক্ষাবিস্তারের ও সমাজসংস্কারের কাজে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর দয়ারও তুলনা ছিল না। সেইজন্য তিনি 'দয়ার সাগর' নামেও পরিচিত। তিনি সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে মার্জিত করে নূতন রূপ দেন। সেইজন্য তাঁকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়। তাঁর লেখা বই—শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, বেতালপঞ্চবিংশতি। শিশুদের জন্য তিনি লিখেছিলেন—বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয় ইত্যাদি।

'রামজয় তর্কভূষণ' প্রবন্ধটি তাঁর অসম্পূর্ণ রচনা 'বিদ্যাসাগরচরিত' থেকে নেওয়া হয়েছে।

কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়)

কৃত্তিবাস ওঝা নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মেছিলেন। তাঁর জন্মকাল সঠিক জানা যায় নি। অনুমান চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি জন্মেছিলেন। তিনি মহাকবি বাল্মিকীর সংস্কৃতে লেখা রামায়ণ অবলম্বন করে বাংলায় পয়ার ছন্দে রামায়ণ রচনা করেন। তাঁর আগে অন্য কেউ বাংলায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় নি। আমরা এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে ভাষা পাই সে ভাষা অবশ্য কৃত্তিবাসের আসল ভাষা নয়। গায়কের মুখে-মুখে ভাষা বদলাতে বদলাতে প্রায় আধুনিক ভাষার রূপ পেয়েছে।

'রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ' কাব্যাংশটি তাঁর 'রামায়ণ' থেকে নেওয়া হয়েছে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৭৭; মৃত্যু ১৯৫৫। নিবাস—শান্তিপুর, নদীয়া। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলির পরিদর্শকরূপে কাজ করেন এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে অবসর নেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তাঁর কবি-প্রতিভার জন্য 'জগত্তারিণী পদক' দিয়ে সম্মানিত করেছে। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ—প্রসাদী, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদুর্বা, শতনরী, গীতরঞ্জন ইত্যাদি।

কামিনী রায়

জন্ম ১৮৬৪; মৃত্যু ১৯৩৩। পিতৃভূমি বাসণ্ডা, বরিশাল। তিনি ঐতিহাসিক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বি. এ. পাশ করে বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হন। তিনি অতি অল্প বয়স থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ—আলো ও ছায়া, মাল্য ও নির্মাল্য, গুঞ্জন, অশোক-সঙ্গীত, দীপ ও ধূপ, জীবনপথে ইত্যাদি।

কালিদাস রায়

জন্ম ৯ জুলাই, ১৮৮৯; মৃত্যু ২৫ অক্টোবর, ১৯৭৫। জন্মভূমি ও পিতৃভূমি কড়ুই, বর্ধমান। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি তাঁর কবিপ্রতিভার জন্য 'কবিশেখর' উপাধি পেয়েছেন। কবিতা ছাড়া তিনি গল্প, প্রবন্ধ ও সমালোচনাও লিখেছেন। ইনি সাহিত্যের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী পদক' পেয়েছেন। ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে তাঁর 'পর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন।

ছোটদের জন্যও ইনি গল্পের বই লিখেছেন। এঁর কবিতার বই—পর্ণপুট, ব্রজবেণু, সন্ধ্যামণি, ঋতুমঙ্গল, আহরণী, বল্লরী, গাথাঞ্জলি, হৈমন্তী, বৈকালী, পূর্ণাহুতি ইত্যাদি।

'প্রাচীন ভারত' কবিতাটি কবির 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' থেকে নেওয়া হয়েছে।

কমুদরঞ্জন মল্লিক

জন্ম ১ মার্চ, ১৮৮৩; মৃত্যু ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০। ইনি বর্ধমান জেলায় অজয়নদীর ধারে কোগ্রামে বাস করতেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বাংলায় কৃতিত্বের জন্য 'বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক' লাভ করেন। ইনি বহুদিন শিক্ষকতা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে কবিপ্রতিভার জন্য 'জগত্তারিণী পদক' দিয়ে সম্মানিত করেছে। এঁর কবিতার বই—উজানী, নূপুর, রজনীগন্ধা, বনতুলসী, শতদল, তূণীর, বীথি, একতারা, অজয়, স্বর্ণসন্ধ্যা। ছেলেদের জন্য গল্পের বই—হরে মাঝি, মুখোসের দোকান।

চন্দ্রনাথ বসু

জন্ম ১৮৪৪; মৃত্যু ১৯১০। জন্মস্থান—হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রাম। ১৮৬৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় এবং ১৮৬৭ সালে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথম জীবনে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন ও অল্প দিনের মধ্যেই সেই কাজ ছেড়ে দেন ও বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তারপর ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে বাংলা সরকারের অনুবাদকের পদ গ্রহণ করেন ও ঐ পদে থাকার সময়ে চাকুরী থেকে অবসর নেন। তিনি সারা জীবন সাহিত্য সেবা করেছেন। তাঁর লেখা অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। কয়েকখানির নাম—শকুন্তলা তত্ত্ব, ফুল ও ফল, গার্হস্থ্য পাঠ, ত্রিধারা, হিন্দুত্ব, সংযম শিক্ষা, পৃথিবীর সুখ-দুঃখ।

'আমোদের সংযম শিক্ষা' প্রবন্ধটি 'সংযম শিক্ষা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রশেখর কর (বিদ্যাবিনোদ)

ইনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গল্প লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'অনাথ বালক' তাঁর একটি গার্হস্থ্য উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য বইয়ের নাম—সুরবালা, পাপের পরিণাম, সৎকথা ইত্যাদি।

'অনাথ বালক' গল্পাংশটি 'অনাথ বালক' উপন্যাস হতে নেওয়া হয়েছে।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জন্ম ১৮৮৩; মৃত্যু ১৯৬১। জন্মস্থান—২৪ পরগণার হরিনাভি গ্রাম। মেট্রোপলিটন ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করে অধ্যাপনার কাজ নেন ও ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নেন। বিশ্বভারতীর সঙ্গে অনেক দিন যুক্ত ছিলেন। সরল ও সরস ভাষায় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। এঁর লেখা বই—নব্য বিজ্ঞান, বাঙ্গালীর খাদ্য, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিশ্বের উপাদান, ব্যাধির পরাজয়, পদার্থবিদ্যার নবযুগ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী, তড়িতের অভ্যুত্থান ইত্যাদি।

'রং' প্রবন্ধটি তাঁর 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ২৩ জুলাই, ১৮৭৮, মৃত্যু ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। পিতৃভূমি—লাভপুর, বীরভূম জেলা। প্রথম জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করে কারাবরণ করেন। তিনি অনেক গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেছেন। বাংলা দেশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি অনেক সম্মান পেয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী পদক' ও ডি. লিট. উপাধি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করেছেন। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেছেন। তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা মূল্যের 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করেছেন।

তাঁর লেখা গল্পের বই—জলসাঘর, রসকলি, বেদেনী, যাদুকরী ইত্যাদি; উপন্যাস—রাইকমল, ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, আগুন, মহাশ্বেতা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, সপ্তপদী, কবি ইত্যাদি; নাটক—কালিন্দী, দুই পুরুষ, বিংশ শতাব্দী, দ্বীপান্তর, যুগ-বিপ্লব ইত্যাদি।

'হিজল বিল' রচনাটি 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' থেকে নেওয়া হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম ১৮৬৩; মৃত্যু ১৯১৩। নিবাস—কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এম. এ. পাশ করে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলাত যান। ফিরে আসার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি কবিতা ও নাটক রচনা উভয় ক্ষেত্রেই খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর গান, বিশেষ করে

হাসির গান বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর কাব্যগ্রন্থ—আর্যগাথা, আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য, হাসির গান, গান ইত্যাদি; নাটক—সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, মেবার পতন, পুনর্জন্ম ইত্যাদি।

'স্বদেশ রক্ষা' নাট্যাংশ 'মেবার পতন' নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম

জন্ম ১৮৯৯। জন্মভূমি—চুরুলিয়া, বর্ধমান। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালী পল্টনে যোগদান করেছিলেন। যুদ্ধের শেষে ফিরে এসে দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করেন। এই সময়েই তিনি কাব্যচর্চা সুরু করেন ও অল্পদিনের মধ্যেই কবি হিসাবে যশ লাভ করেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য তিনি 'বিদ্রোহী কবি' নামে পরিচিত হন। তিনি অনেক গানও রচনা করেছেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ—অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, সন্ধ্যা, সর্বহারা, চক্রবাক ইত্যাদি।

'পথচারী' কবিতাটি তাঁর 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৭৩; মৃত্যু ১৯৩২। আদি নিবাস—হুগলী জেলার গুরুপ। তিনি বি. এ. পাশ করে কিছুদিন কেরাণীর কাজ করেন। তারপর ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলাত যান এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি আগেই লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি পূর্ণ উদ্যমে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় মন দেন। তিনি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'মানসী ও মর্মবাণী' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনার কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

তাঁর লেখা উপন্যাস—নবীন সন্ন্যাসী, রত্নদীপ, আরতি, সিন্দুর কৌটা, সত্যবালা ইত্যাদি; ছোটগল্প—ষোড়শী, দেশী ও বিলাতী, গল্পাঞ্জলি, পত্রপুষ্প, গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প' ইত্যাদি।

'মাষ্টার মহাশয়' গল্পটি 'গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প' থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জন্ম ১৯০৪। জন্মস্থান কাশী, নিবাস কলিকাতা। ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ও কথাসাহিত্যিক। ছোটদের জন্য লেখাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'সাগর থেকে

ফেরা' নামে কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি আকাদেমী পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ ইত্যাদি; ছোটগল্পের বই—বেনামী বন্দর, পঞ্চশর, পুতুল ও প্রতিমা, মৃত্তিকা, অফুরন্ত ইত্যাদি; বড় গল্প ও উপন্যাস—বাঁকা লেখা, উপনয়ন, আগামী কাল, প্রতিশোধ, পাঁক ইত্যাদি; ছোটদের জন্য বই—ঘনাদার গল্প, অদ্বিতীয় ঘনাদা, গল্পসঙ্কলন ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৩৮; মৃত্যু ১৮৯৪। পিতৃভূমি কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি, চব্বিশ পরগণা। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন ও ১৮৯১ সালে সেই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলা হয়। তিনি উপন্যাস ছাড়া অনেক প্রবন্ধের বইও রচনা করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। অন্য উপন্যাস—কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ, সীতারাম, ইন্দিরা, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় ইত্যাদি; অন্য গ্রন্থ—কমলাকান্তের দপ্তর, লোক-রহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণ চরিত্র।

'বন্দে মাতরম্' রচনাটি 'আনন্দ মঠ' থেকে নেওয়া হয়েছে।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৮৭০; মৃত্যু ১৮৯১। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্র ছিলেন। তিনি অল্পদিন বেঁচেছিলেন কিন্তু তার মধ্যেই তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যে নিজের আসন করে নিয়েছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হত। তিনি অনেক কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা বই—চিত্র ও কাব্য (নিবন্ধ), মাধবিকা (কাব্য), শ্রাবণী (কাব্য) ইত্যাদি।

মধুসূদন দত্ত

জন্ম ১৮২৪; মৃত্যু ১৮৭৩। পিতৃভূমি সাগরদাঁড়ি, যশোহর। তাঁর পিতা ছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত। হিন্দু কলেজ ও বিশপস্ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ও তাঁর নূতন নাম হয় মাইকেল মধুসূদন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যান ও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরেন। প্রথমে তিনি ইংরাজীতে কাব্য রচনা করেন, পরে বাংলা ভাষায় লেখা আরম্ভ করেন। বাংলা ভাষায় তিনি সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন

করেন এবং সনেট রচনা করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য "মেঘনাদবধ"। বাংলায় তিনি প্রথম পাশ্চাত্যরীতি অনুসারে নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী (সনেটের সংকলন); নাটক—শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী; প্রহসন—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ইত্যাদি।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম ১৯০৯ সাল; মৃত্যু ১৯৬৯। তিনি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র ও প্রখ্যাত কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র। তিনি অনেক গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকথা লিখেছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থ—দক্ষিণের বারান্দা, অসমাপ্ত চটাব্দ, লাফা যাত্রা, চরণিক ইত্যাদি। ছোটদের জন্য তিনি লিখেছেন—বাবুইয়ের এ্যাডভেঞ্চার, বোর্ডিং স্কুল ইত্যাদি।

'চরণিক' গদ্যাংশটি 'চরণিক' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

মোহিতলাল মজুমদার

জন্ম ১৮৮৮; মৃত্যু ১৯৫২। জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া, চব্বিশ পরগণা। পিতৃনিবাস—বলাগড়, হুগলি। ১৯০৮ সালে বি. এ. পাশ করেন। প্রথম যৌবনে অনেকদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন। কবি ও সমালোচক হিসাবে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ—স্বপন পসারী, বিস্মরণী, স্মরগরল ও হেমন্ত গোধূলী; সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ—সাহিত্য বিতান, আধুনিক সাহিত্য, বিবিধ প্রবন্ধ, রবীন্দ্র কাব্য ইত্যাদি।

যোগীন্দ্রনাথ বসু

জন্ম ১৮৫৭; মৃত্যু ১৯২৭। জন্মস্থান—চব্বিশ পরগণা জেলার নিতাড়াগ্রাম। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও সুকবি ছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থ—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, পৃথ্বীরাজ, অহল্যাবাঈ, পতিব্রতা, শিবাজী, তুকারাম, দেববালা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৮৬১; মৃত্যু ১৯৪১। জন্মস্থান কলিকাতার জোড়াসাঁকো। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। কাব্য-সঙ্গীত-নাটক-গীতিনাট্য-উপন্যাস-

গল্প-প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনী, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও কিশোরের জন্য রচনা—সাহিত্যের সকল বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন ও সারা পৃথিবীতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বছরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর' উপাধি দেন ও ভারত সরকার 'নাইট' (স্যার) উপাধি দেন। কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা-বাগে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সেই উপাধি তিনি পরিত্যাগ করেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। বোলপুরে শান্তিনিকেতনে তিনি বিশ্বভারতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেইটি এখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা অনেক। এখানে কতকগুলির নাম দেওয়া হল। কবিতা—সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, মানসী, কল্পনা, চিত্রা, খেয়া, বলাকা, পত্রপুট, মহুয়া, জন্মদিনে, আরোগ্য; উপন্যাস—চোখের বালি, নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে, গোরা, যোগাযোগ, চতুরঙ্গ; নাটক—রাজা, রক্তকরবী, তাসের দেশ, বাঁশরী, প্রজাপতির নির্বন্ধ, শেষরক্ষা, চিরকুমার সভা; ভ্রমণ—রাশিয়ার চিঠি, জাপানযাত্রী, যাত্রী; প্রবন্ধ—প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, শান্তিনিকেতন, পঞ্চভূত।

পাঠমালিকায় রবীন্দ্রনাথের যে রচনা দেওয়া হয়েছে সেগুলি কোন্ কোন্ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে নীচে দেওয়া হল ঃ

দীন দান—কাহিনী; প্রভাত উৎসব—প্রভাত সংগীত; সভ্যতার প্রতি—চৈতালী; খরবায়ু বয় বেগে—তাসের দেশ; হে মোর দুর্ভাগা দেশ—গীতাঞ্জলি; ছোটনাগপুর—বিচিত্র প্রবন্ধ; কাবুলিওয়ালা—গল্পগুচ্ছ; বর্তমান যুগ—শান্তিনিকেতন।

রাজশেখর বসু

জন্ম ১৮৮০; মৃত্যু ১৯৬১। পিতৃভূমি নদীয়া জেলার উলাবীরনগর। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। তারপর তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেন। হাসির গল্প রচনায় তাঁর তুলনা পাওয়া যায় না। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'পরশুরাম'। তাঁর হাসির গল্পের বই—গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, গল্পকল্প, ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি। হাসির গল্প ছাড়া তিনি লিখেছিলেন চলন্তিকা (অভিধান), লঘু-গুরু, কুটিরশিল্প, কালিদাসের মেঘদূত, ভারতের খনিজ, বাল্মীকি রামায়ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত মহাভারত, হিতোপদেশের গল্প। এগুলি তাঁর নিজের নামে প্রকাশিত।

'জতুগৃহদাহ' রচনাটি 'কৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত মহাভারত' থেকে নেওয়া হয়েছে।

লীলা মজুমদার

জন্ম ১৯০৮। ইনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে বি. এ.-তে ইংরাজী অনার্সে এবং ১৯৩০ সালে ইংরাজীতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুদিন অধ্যাপনার কাজ করেন ও পরে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁর লেখা বড়দের জন্য বই—শ্রীমতী, ঝাঁপতাল, চীনে লণ্ঠন, মণিমালা, মণিকুন্তলা, জোনাকি ইত্যাদি। ছোটদের বই—দিন দুপুরে, পদিপিসির বর্মীবাক্স, হলদে পাখীর পালক, ছোটদের ভাল ভাল গল্প ইত্যাদি। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেছেন।

'পেয়ারা গাছের নীচে' গল্পাংশটি তাঁর 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' থেকে নেওয়া হয়েছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৭৬; মৃত্যু ১৯৩৮। জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। প্রথম জীবনে ব্রহ্মদেশে চাকরী করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। তাঁর অপূর্ব লেখার জন্য তাঁকে অপরাজেয় কথাশিল্পী বলা হত। তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলির নাম—শ্রীকান্ত (১ম—৪র্থ পর্ব); দেবদাস, বড়দিদি, পল্লীসমাজ, ষোড়শী, দত্তা, মেজদিদি, বিন্দুর ছেলে, অরক্ষণীয়া, বিপ্রদাস, চরিত্রহীন, শেষ প্রশ্ন, পথের দাবী, বিরাজ বৌ, পরিণীতা ইত্যাদি।

'বিন্দুর ছেলে' শীর্ষক গদ্যাংশ 'বিন্দুর ছেলে' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম ১৮৮২; মৃত্যু ১৯২২। পিতৃভূমি চুপী, বর্ধমান। জন্মস্থান কলিকাতা। এঁর পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। ইনি বাংলা কবিতায় অনেক রকম ছন্দ ব্যবহার করেছেন। সেই জন্য এঁকে ছন্দের যাদুকর বলা হয়। এঁর লেখা কবিতার বই—হোমশিখা, কুহু ও কেকা, অভ্র, আবীর, তুলির লিখন, মণিমঞ্জুষা, বিদায় আরতি, তীর্থরেণু, তীর্থসলিল, ফুলের ফসল ইত্যাদি।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

জন্ম ১৯৫৬; মৃত্যু ১৯৪৭। জন্মস্থান কলিকাতা। পিতৃভূমি মাদারীপুর, ফরিদপুর।

মাত্র বিশ বছর ইনি বেঁচেছিলেন, কিন্তু, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি কবিপ্রতিভার অসামান্য পরিচয় দিয়েছেন। এঁর গ্রন্থ—ছাড়পত্র, পূর্বাভাষ।

সুরেন্দ্রনাথ সেন

জন্ম ১৮৯০; মৃত্যু ১৯৬২। শিক্ষা—ঢাকা, কলিকাতা ও অক্সফোর্ড। শিক্ষার শেষে ইনি অনেকদিন অধ্যাপনা করেছিলেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন। পরে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জাতীয় সংগ্রহশালার অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ঐতিহাসিক হিসাবে ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইনি ইংরাজীতে অনেক ইতিহাসের বই লিখেছেন। বাংলায় লিখেছেন বাংলা পত্রসংকলন, ইতিহাসের আলপনা ইত্যাদি।

'সেকালের বাজার দর' প্রবন্ধটি 'ইতিহাসের আলপনা' থেকে নেওয়া হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

জন্ম ১৮৬৩; মৃত্যু ১৯০২। প্রথম জীবনে তাঁর নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি, এ. পাশ করেন। এই সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসেন ও পরে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে আমেরিকাতে শিকাগো সহরে যে ধর্ম সম্মেলন হয় তাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেন ও হিন্দু ধর্মের পক্ষে বক্তৃতা করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। আমেরিকা ছাড়া তিনি ইউরোপেও ভ্রমণ করেন। অনেক বিদেশী তাঁর শিষ্য হন। জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। তাঁর লেখা বই—জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৩৮; মৃত্যু ১৯০৩। জন্মভূমি হুগলী জেলার গুলিটা গ্রাম। হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বি. এ. পাশ করে প্রথম যৌবনে শিক্ষকতা করেন। পরে বি. এল. পাশ করে এক বৎসর মুন্সেফি করেন। মুন্সেফি ছেড়ে হাইকোর্টে ওকালতি করেন। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হন। 'বৃত্রসংহার' কাব্য তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর অন্য কবিতা-গ্রন্থ—দশমহাবিদ্যা, অশোকানন, ছায়াময়ী, কবিতাবলী ইত্যাদি।

'ভারতসঙ্গীত' কবিতাটি তাঁর 'কবিতাবলী' থেকে নেওয়া হয়েছে।
